Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রমেশ শীল : অগ্রথিত গীতিগুচ্ছ

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.4
Pages	44-85
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রমেশ শীল : অগ্রথিত গীতিগুচ্ছ

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

এক ॥ কবিগানের ভূমিকা

বাংলাদেশের মানুষের বোধনে কবিগান, কবিয়াল ও রমেশ শীল —এই অস্তিত্বত্রয় প্রায় সমার্থক। ফলতঃ রমেশ শীল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ততম উচ্চারণের পূর্বেও কবিগান ও কবিয়াল সংক্রান্ত গৌরচন্দ্রিকা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও পূর্বসূত্রের ন্যায় অপরিহার্য।

কবিগান সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর বর্ণনা নিম্নরূপ :

Kavi song is an open air performance. It is a highly exciting dialogue in verse. In fact it is a poetic battle between two contesting poets. Kavi songs were originally based mainly on religious traditions, but in later years their scope was extended to include almost all subjects. Sometimes kavi leads to violent presonal attacks on the opponent producing all the thrills of the moment, thus transgressing at times the limits of decorum and decency. Occasionally the poetical conversation becomes highly witty while thousands of people listen with rapt attention.[১]

বঙ্গে কবিগানের সূচনা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সুকুমার সেনের মতে,

"অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পরে এইরূপ বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাঁড়া কবি।...

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাঁড়া কবি শিক্ষিত গীত রচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তর গান রচনার ধারাও প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই 'কবিগান'। এইরূপ গীত যাঁহারা করিতেন তাঁহারা কবিওয়ালা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।"[২]

দুই ॥ কবি-জীবন ও মানস-সূত্র

চট্টগ্রাম শহর হতে কক্সবাজার যাবার পথে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে গোমদণ্ডী গ্রাম। বাংলা ১২৮৪ (১৮৭৭ খৃ.) সনের ২৬ শে বৈশাখ (শুক্রবার) এই গ্রামে শ্রীমতী রাজকুমারীর গর্ভে চণ্ডীচরণ শীলের একমাত্র পুত্র রমেশচন্দ্র শীলের জন্ম।[৩]

গোমদণ্ডী রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী শীল পরিবারটির আর্থিক অবস্থা তখন ভাল নয়। রমেশ শীলের ভাষায়,

"মাতামহ কৃষক ও ক্ষৌরকর্ম করতেন। পিতা পিতামহ ক্ষত চিকিৎসা ঘায়ের লতা-পাতা দিয়া আর বাত ফোরা ওপারেসান। উভয় কুল আর্থিক কষ্ট ছিল। কোনরকমে খাওয়া পড়া চলত।" [৪]

সাত বছর বয়সে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হল রমেশ শীলকে। কিন্তু তার ঝোঁক গানের দিকে। "ছোটবেলা হতে গান-বাজনা ও ধর্মীয় ভাবধারায় পাগল ছিলাম। ···বাবা গান বাজনায় আমার ঝোক দেখে প্রাইমেরি ইস্কুলে পড়াকালীন বৃহৎ তরজার লড়াই নামক বই কিনে দেন। পাড়ায় রমেশ শীল ও শ্যামাচরণ নামক আরও দুইজন আমার সমবয়স্ক ছেলে ছিল। সন্ধ্যা পর পাড়ার লোকেরা আমাদের দুইজনকে দিয়ে তরজা মুখস্ত করা গান শুনত। সাত্র (শাস্ত্র) ভক্ত নারী পুরুষ রাধাকৃষ্ণ গানের বিষয়বস্তু ছিল।" [৫]

কিন্তু, ···'একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইতে
বাবা গেল স্বর্গপুরে।
আমিই বালক, চালক, পালক,
আমার আর কেহ নাই।
মায়ের অলংকার সম্বল আমার
বিক্রী করিয়ে খাই।
তিন সহোদরা, মাতা, মাতামহী,
ছয়জনে এক পরিবার।
এই হইল শিক্ষা আমার,
প্রাইমারী পরীক্ষা ভাগ্যে
না জুটিল আর।' [৬]

এই অর্থ সংকটের দিনে রমেশ শীলের স্কুল শিক্ষকরা তাকে বিনা বেতনে পড়ানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু বই এবং গায়ের জামা সংগ্রহও সম্ভব হল না বালকের পক্ষে।

সংসারের এইরকম সর্বব্যাপী অনটনের মধ্যে মায়ের উপর অভিমান করে কিশোর রমেশ শীল একদিন পাড়ি দেন বার্মার পথে। প্রসঙ্গতঃ, চট্টগ্রামের মানুষের তখন পর্যন্ত চাকুরী ও ব্যবসার প্রধান স্থল ছিল বার্মার রেঙ্গুন ও আকিয়াব শহর। [৭] রমেশ শীল একটানা সাত বছর বার্মায় কাটান, কিন্তু তাঁর সেখানকার পেশা সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। ফিরে আসেন ১৮৯৫-এ, চট্টগ্রামে এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের সংবাদ পেয়ে।

দেশে ফিরে গানের নেশা পেয়ে বসল আবার তাঁকে। এবং সেই সূত্রেই এল তাঁর প্রথম কবিগানে অংশগ্রহণ। রমেশ শীল নিজে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

"তখন বয়েস হবে বছর বাইশ।···
সেবার জগদ্ধাত্রী পুজো। সদরঘাটে কবিগানের আসর হবে খবর পেলাম। গাইবেন চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশী। দুজনেই সেকালের নামকরা কবি।

···'সেই রাত্তিরে গান শুনে কবি হবার শখ আমায় পেয়ে বসল। তারপর দিন নেই, রাত নেই, শুয়ে বসে আমার কেবল এক চিন্তা—কেমন করে ছন্দ আর মিল দিয়ে মনের কথা হাজার হাজার মানুষের কাছে বলা যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটি আর মনে মনে কথার সঙ্গে কথা মেলাই।···

পরের বছর পূজোর সময় আবার সেই কবিয়ালদের জলসা বসেছে। গান গাইতে গাইতে গোড়াতেই চিন্তাহরণের গলা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। মহা মুশকিল। চিন্তাহরণ না গাইলে আসর মাটি হয়ে যায়।···

এমন সময় আসরের একপাশ থেকে কয়েকজন মুসলমান এসে জোর করে আমাকে টেনে তুলল।···উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পা ঠক ঠক করে কাঁপছে।··· মোহনবাঁশী এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, মেরে-কেটে দাদা রাত দশটা বাজিয়ে দাও, নইলে বায়নার টাকাটা মাঠে মারা যায়। কী আর করব। যা থাকে বরাতে বলে কপাল ঠুকে উঠে দাঁড়ালাম। গানের গোড়াতেই মোহনবাঁশী এমন যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন যে, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কথার তীর দিয়ে সোক্ষম করে বিঁধলাম মোহন-বাঁশীকে। গায়ের জ্বালায় মুখে যেন আপনা আপনি কথা জুটে যেতে লাগল। জমে উঠল আসর। আমারও সাহস বেড়ে গেল। এদিকে রাত দশটা কাবার হয়ে পরদিন সকাল দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙ্গতে চায় না।···

সেই থেকে আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বায়না পেতে লাগলাম। শুরু করে দিলাম গানের ব্যবসা।''৮

সেদিনের গানের বিষয় ছিল 'শূর্পণখা ও মধু দৈত্য'। আর কবিয়াল রমেশ শীলের প্রথম পদ ছিল,

'উৎসাহ আর ভয়
লজ্জাও কম নয়
কেবা থামাইবে কারে ?'৯

কবিগানের প্রয়োজনেই রমেশ শীল শুরু করলেন নতুন করে অধ্যয়ন। মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, কোরানের বাংলা অনুবাদ, কাসাসুল আম্বিয়া, মহানবীর জীবনী প্রভৃতি স্থান পেল তার পাঠ্য বিষয়ে।

তেইশ বছর বয়সে (১৯০০ খ্রী.) শ্রীমতী অপূর্ব বালার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন রমেশ শীল। দাম্পত্য জীবনের রোমাঞ্চ তার মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ''আমার বিবাহিত জীবনে কবিগানের প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রেমের গান ও বিরহ গান সে হতে আরম্ভ।''১০

রমেশ শীলের সমাজ-সচেতন কাব্য সৃষ্টির সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৯১৯ খ্রী.)। যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের তীব্র সংকট কবিয়ালের মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। তিনি রচনা করেন,

···'পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয় আঁধারে মরি
পাইনা কেরোসিন।'১১

রমেশ শীলের এই সমাজ-সচেতনতাই অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২১), আসাম-বেঙ্গল রেল ধর্মঘট (১৯২২), চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ (১৯৩০) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী গণচেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

তেতাল্লিশ বছর বয়সে (১৯২০) রমেশ শীলের দ্বিতীয় বিয়ে; কন্যা শ্রীমতী অবলা বালা। বর্তমানে অশতিপর এই বৃদ্ধা সারাজীবন রমেশ শীলের সাধনসঙ্গী ছিলেন।

১৯২৩-এ কবিয়ালের জীবনে ঘটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রমেশ শীল চট্টগ্রাম শহরস্থ মাদারবাড়ী অঞ্চলের নসু মালুমের ভক্ত ছিলেন।[১২] ছেচল্লিশ বছর বয়সে রমেশ শীল প্রথম চট্টগ্রামের নাজিরহাটের নিকটবর্তী জনপ্রিয় পীরের দরবার মাইজভাণ্ডারে যান।[১৩] তাঁর নিজের ভাষায়,

"হযরত গাউচুল আজম কেন যে আমার মতন নিরক্ষর লোকের উপর এমন মহান কাজের ভার দিলেন তাহা তিনিই জানেন। আমি কি শুভ মুহূর্তে শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর সঙ্গ নিয়াছিলাম তাহা বাবাজান ভিন্ন অন্য কেহ জানিবার কারণ নাই। গত ১৩৩৩ সালের ৯ই মাঘ শ্রীযুক্ত সারদা বাবু আমাকে মাইজভাণ্ডার ওরশে লইয়া যান। তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রাণ যেন কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হিল্লোলে খেলিতে লাগিল এবং কে যেন কানে কানে বলিল, রমেশ এই মাইজভাণ্ডারের ভক্তগণকে তোর গান শুনাইতে হইবে। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, শরীর আড়ষ্ট হইল।"[১৪]

তরপর হতে প্রতি বছর রমেশ শীলের গান মাইজভাণ্ডারের ওরশের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। অন্যদিকে রমেশ শীলের চেতনায় মাইজভাণ্ডারের ধর্মীয় ভাবধারা[১৫] ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ফলতঃ তিনি হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় কলহের ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং বাউল মতবাদের সমধর্মী এক ধরনের সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসে উপনীত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে রমেশ শীল কবিগানকে প্রচলিত অশ্লীলতা ও সামন্ত-প্রভুদের বিলাসের উপকরণ হতে মুক্ত করার সাংগঠনিক উদ্যোগ নেন। তার মনে বেদনা ছিল,

"···গ্রাম্য কবিগণ পেটের দায়ে এবং মোটা অর্থের প্রলোভনে জমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আসিয়া ভিড় জমাইল। বাউণ্ডুলে ইয়ার-দোস্ত পরিবৃত ধনী জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া গ্রাম্য কবিগণ অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচিল, গান গাহিল।"[১৬]

'কুরুচিপূর্ণ গান ছেড়ে দাও'-এই শ্লোগান নিয়ে রমেশ শীলের নেতৃত্বে ১৯৩৮-এ গঠিত হয় "রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ"।[১৭] কবিগানের রূপান্তরের ইতিহাসে এই সমিতি গঠনের কাজটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪২-এ এসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী বামপন্থীদের দৃষ্টিতে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমে জনতার সামনে রাজনীতিকে উপস্থিত করার উপর অত্যন্ত জোর দেয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।[১৮] রমেশ শীল তাঁর গানে একদিকে তুলে ধরেন মন্বন্তরের চিত্র, অন্যদিকে জনতাকে আহ্বান জানান ফ্যাসীবাদকে রুখে দাঁড়াতে। কবিগানকে নতুন করে জনতার সঙ্গে একাত্ম করার অঙ্গীকার নিয়ে "রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ"কে পুনর্গঠিত করে জন্ম নেয় "জেলা কবি সমিতি"। ঘটনাটি ঘটে চট্টগ্রামের রাউজান থানার বাগোয়ানে জেলা কৃষক সম্মেলনে কবিগানের পর (১৯৪৩)।

সম্ভবত এই বছরেই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে রমেশ শীলের চিন্তা ও চেতনায় কমিউনিস্ট পার্টি'র আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রকাশ ঘটে অত্যন্ত প্রকটভাবে। ফলতঃ জনগণকে ভালোবাসার ও মেহনতী মানুষের মুক্তির স্বচ্ছ বিপ্লবী দৃষ্টি অর্জন করেন তিনি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির কতিপয় রাজনৈতিক ভ্রান্তিও সময় সময় তার রচনায় প্রকাশ পায়।

১৯৪৫-এ কবিগান নিয়ে চট্টগ্রামের বাইরে এলেন রমেশ শীল। তাঁর এ পর্যায়ের প্রথম কবিগান বর্ধমানের হাটগোবিন্দপুরে কৃষক সভার অষ্টম প্রাদেশিক সম্মেলনে (মার্চ, ১৯৪৫)।[১৯] এরপর তিনি অংশ গ্রহণ করেন কলকাতায় (মোহম্মদ আলী পার্কে) অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে'।[২০] সেদিনের কবিগানের বর্ণনা পাওয়া যায় কলকাতার একটি সংবাদপত্রে এভাবে,

"All awaited the appearance of the famous bards billed for the evening—Ramesh Seal, nature's own patriotic poet from Chittagong with an able lieutenant in Phani Barooa on the one side, and Sheikh Gomhani, champion bard of west Bengal with his lieutenant the voluble Lambodar on the other...When Ramesh Seal potrayed the devastation that imperialist exploitation has brought upon our land and sang of national unity, it was obvious that any day Ramesh could beat most speakers hollow."[২১]

কলকাতার মোহম্মদ আলী পার্কে একই বছর রমেশ শীল 'নিখিল বঙ্গ বন্দীমুক্তি কমিটি' আয়োজিত দর্শনীর বিনিময়ে কবিগানে অংশগ্রহণ করেন। "টিকিট করেও সেদিন প্রায় বিশ হাজারের মত লোক রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার কবিগান শুনতে সমবেত হয়েছিল।"[২২]

একই বছর রমেশ শীল নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনে' কবিগানে অংশ নেন।

১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় "নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন" (AISF)-এর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। রমেশ শীলের উদ্বোধনী গান দিয়ে ঐ সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল।[২৩]

চল্লিশের দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থায় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদীর চাইতেও বেশী হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরস্পরের উপর। ফলে বঙ্গভূমিও রক্তাপ্লুত হল দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মানুষের রক্তে। চল্লিশের মাঝামাঝি পেঁৗছে স্থির হয়ে গেল বঙ্গের পূর্বাঞ্চল হবে মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান। পরিণামে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা (এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা) পতিত হল এক মহাসংকটে। শুরু হল শত শত বছরের পিতৃপুরুষের বসত-ভিটে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও দেশত্যাগ। বামপন্থীরা এ সংকটে কোন আশার বাণী শোনাতে পারলেন না। রমেশ শীলও এ সংকটের দ্বন্দ্ব বহন করলেন আপন চেতনায়। একদিকে কলকাতার পথে পথে (১৯৪৬) গাইলেন,[২৪]

'হিন্দু-মুসলিম মারামারি
দেশে এল কি ঘটনা
যত কুলী মজুর গরীব মরে,
নেতারা তা কেউ মরে না।'

অন্যদিকে পাকিস্তানকে বরণ করে বললেন,

'উড়াও লীগের পতাকা যত মুসলমান
আল্লাহু আকবর আসবে স্বাধীন পাকিস্তান ।।'

আবার আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ তিনি উচ্চারণ করলেন,

···'হবে শান্তি স্থাপন করেছে পণ
সগর্ব্বে জোলিও কুরী।
শান্তির তুর্যনাদ শুনি,
মনেতে আতংক গণি
সাম্রাজ্যবাদী উঠেছে শিহরি।'

এবং স্থির করেন পাকিস্তানই হবে রমেশ শীলের আবাসভূমি,

'আঁয়ার এই ঘরবাড়ি কারে দিতাম।
আঁয়ারে কন ভূতে পাইয়ে হিন্দুস্তান যাইতাম।'···

[আমার এই ঘরবাড়ী কাকে দিব? আমাকে কি ভূতে পেয়েছে যে হিন্দুস্থান যাব।]

কিন্তু সাতচল্লিশ পার না হতেই বামপন্থীদের চোখে পাকিস্তানের স্বপ্ন ফ্যাকাসে হতে শুরু করল। রমেশ শীল তুলে ধরলেন স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের কথা। ১৯৪৮-এ রণদীভের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের হঠকারী কর্মসূচী ঘোষণা করল। তাতেও উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিলেন রমেশ শীল।

এর মধ্যে (১৯৪৮) কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক কবিগানের অনুষ্ঠানে রমেশ শীলকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের পদক পরিয়ে দেওয়া হল।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন গভীরভাবে রমেশ-চিত্তকে নাড়া দিল। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনের উপর গান গেয়ে বেড়ালেন সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায়। ১৯৫২-র এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত All India Cultural Conference & Festival for Peace-এ যোগদানের জন্য উদ্যোক্তারা আমন্ত্রণ জানান রমেশ শীলকে।[২৫]

১৯৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রচারে রমেশ শীল সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। একই বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে' লোকসাহিত্য বিভাগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তিনি এবং ঢাকা স্টেডিয়ামে কবিগান পরিবেশন করেন।

কিন্তু এই বছরেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারী করা হয়। অনেক দেশপ্রেমিকের মত রমেশ শীলের বাড়ীতে পুলিশ হামলা করে এবং তাঁকে নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। প্রথম তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে ও পরে ঢাকা জেলে রাখা হয়। ঢাকা জেলে থাকাকালীন সহবন্দীরা তাঁর জন্মদিন (১৯৫৫) পালন করে।[২৬] পরের বছর পাকিস্তানে সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ক্ষমতা গ্রহণ করলে অন্য রাজবন্দীদের সঙ্গে রমেশ শীলও মুক্তিলাভ করেন। মুক্ত রাজবন্দী পুনর্বাসন তহবিল হতে তাঁকে এককালীন তিনশত টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। ১৯৫৭-তে মাওলানা ভাসানী আহুত কাগমারী সম্মেলনে কবিগানে অংশ নেন রমেশ শীল।

১৯৫৯-এ রমেশ শীল মাসিক চল্লিশ টাকা হারে সরকারী ভাতা লাভ করেন। চিঠিতে বলা হয় :

In recognition of the meritories literary activities...to the Bengali literature, Government are pleased to sanction a literary pension.. ২৭

কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপে রুষ্ট হয়ে সরকার পরে (১৯৬২) এই ভাতা প্রত্যাহার করেন এবং রমেশ শীল গৃহীত শেষ তিন মাসের টাকা ফেরত দাবী করেন। ২৮

পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী (১৯৬১) উদ্‌যাপন সরকারের বাধার মুখে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রূপ ধারণ করে। রমেশ শীলও রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ২৯ তাঁর রচনাবলীতেও দেখা যায় যে অ-চট্টগ্রামী বাঙালী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলাম তাঁর হৃদয়ে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা) তাদের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (১ জুলাই, ১৯৬২) উপলক্ষে রমেশ শীলকে এক সম্বর্ধনা প্রদান করে। ৩০ মানপত্রে বলা হয় :

"... মহান লোক-সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করছেন আপনি। আপনার গানে এই দেশের লোকসাধারণের মর্মবাণী রূপ পেয়েছে। আপনি আমাদের গৌরবস্থল।

...সার্থক শিল্পীর ও সচেতন নাগরিকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে আপনার মধ্যে। অসাধারণ শিল্প-সাফল্য জনসাধারণের সঙ্গে আপনার দূরত্ব রচনা করেনি, বরঞ্চ নৈকট্য সৃষ্টি করেছে।... আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আপনার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"৩১

একই বছরে বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী তাঁকে সম্মানসূচক এককালীন দুইশত পঞ্চাশ টাকা ভাতা প্রদান করে। ৩২ অন্যদিকে পাকিস্তান গ্রামোফোন কোম্পানী রমেশ শীলের গানের রেকর্ড প্রকাশ করে এই বছর।

চট্টগ্রামে (মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে) কবিয়াল রমেশ শীলকে নাগরিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এর দু'বছর পর (১০ এপ্রিল, ১৯৬৪)। ৩৩ মানপত্রে বলা হয় :

"... শান্তির সপক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার সংগ্রাম আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অক্ষয় স্বাক্ষর রচনা করিয়াছে।...

বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আপনার অকুতোভয় অভিযান আমাদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু।"...৩৪

কবিয়ালের শেষ জীবন কেটেছে অত্যন্ত অনটনের মধ্যে। তাঁর নিজের ভাষায় :

"...হঠাৎ রোগে আক্রমণ, তদুপরি বার্ধক্যের জরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ—ঘূর্ণিবাত্যা বন্যা ইত্যাদির কবলে পরে আর বাঁচবার আশা করতে পারতেছি না। অভাব অনটনে পরে রীতিমত রোগের চিকিৎসাও চলতেছে না।"... ৩৫

১৯৬৭ সালের ৬ই এপ্রিল নিজগ্রামে রমেশ শীল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবার ও শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।[৩৬] বর্তমানে গোমদণ্ডীতে একটি পুকুরধারে বৃক্ষছায়ায় মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনি পরিবৃত কবিয়ালের সমাধি তাঁর আজীবন লোকবাদিতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিন ।। সৃষ্টির পটভূমি

রমেশ শীল নামটির সঙ্গে কবিয়াল উপাধির দীর্ঘসময়ের অচেছদ্য বন্ধন হতেই স্পষ্ট যে কবিগানই তার মূল সৃষ্টি। কবিগান মৌখিক ও তাৎক্ষণিক রচনা এবং দুই মূল কবি ও সহযোগীদের যৌথ অবদানে সম্পূর্ণ। ফলতঃ একে লিপিবদ্ধ করা কিংবা পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কোন প্রচলিত রীতি নেই। বলা বাহুল্য, রমেশ শীলের কোন কবিগানও পুস্তক কিংবা পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত হয় নি।

তবে কবিগানের কাঠামোর মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে খণ্ড কবিতার সম্ভাবনা ও বীজ। কবিগানের কাঠামো নিম্নরূপ :[৩৭]

১.	আসর-বাজা	[দুই পক্ষের বাজন্দারদের পর পর দীর্ঘসময় বাজনা বাজানো।]
২.	ডাক গান	[দোহার কর্তৃক]
৩.	সদর মালসী	[দোহার কর্তৃক]
৪.	রং ধুয়া	[দোহার কর্তৃক]
৫.	বন্দনা	[মূল কবি কর্তৃক পীর, আউলিয়া, দেবতা, নবী ও সৃষ্টিকর্তার বন্দনা]
৬.	টপ্পা	[কবির আত্ম-পরিচয় দান]
৭.	সভা-বন্দনা	
৮.	জেরা	[কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই পক্ষের প্রশ্নোত্তর। এটিই কবিগানের মূল অংশ।]
৯.	রং ও বোল পাঁচালি	[জেরার পরবর্তী সময়ে দেহতত্ত্ব, শাস্ত্র, ধর্ম, দেশীয় সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ক গান]
১০.	যোটক	[গানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হলে আপোষমূলক মিলন সঙ্গীত।]

স্পষ্টতঃই এই কাঠামোর তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম অংশ পৃথক কবিতা হিসেবেও সৃষ্টি এবং সমাদৃত হতে পারে। তাই বাল্য এবং কৈশোরে কিছু পদ্য রচনা করলেও রমেশ শীলের কাব্যচর্চা কবিগানের অংশ হিসেবে শুরু, এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হবে না।

বিশেষতঃ কবিয়ালের রচনার মধ্যে মালসী, আত্ম-পরিচয়মূলক কবিতা এবং রং ও বোল পাঁচালির উপস্থিতি এ সিদ্ধান্তের সমর্থনবাহী।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে রমেশ শীলের প্রেম ও বিরহের কবিতার সূচনা তাঁর প্রথম বিয়ের সমকালে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি রক্ষণশীল গ্রাম-সমাজে তেইশ বছরের তরুণ রমেশ শীলের প্রথম নারী-প্রণয় লাভে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। এবং যেহেতু মূলতঃ তিনি কবি, সুতরাং রোমাঞ্চের প্রকাশ ঘটবে কাব্যে, এও নিতান্ত স্বাভাবিক। আবার বিশ বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে অনিবার্যভাবেই ইঙ্গিত দেয় এর পূর্ববর্তী একটি বেদনা-বিধূর বিরহ পর্বের, যার ফসল রমেশ শীলের বিরহের গান।

ছেচল্লিশ বছর বয়সে রমেশ শীল প্রথম মাইজভাণ্ডার যান। মাইজভাণ্ডারের পীরের দৃষ্টি প্রথম চমকেই তাঁকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। রমেশ শীলের অধ্যাত্ম-বিষয়ক রচনার এখানেই সূত্রপাত, যদিও কবিগানেও ছিল অধ্যাত্মচর্চার বীজ।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে রমেশ শীলের পরিচয় ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, কষ্টকল্পিত নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ; তাঁর সারাজীবন কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। জীবনে নিরন্ন কৃষক-বাস পল্লীগ্রাম ছেড়ে দ্বিতীয় কোথাও আবাস স্থাপন করেন নি। মন্বন্তরে সাথীর মৃত্যু দেখেছেন, দুর্যোগে নিজে গৃহহারা হয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় মানুষের দুঃখের বারোমাসী এসেছে অত্যন্ত সহজে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আপাদমস্তক সিক্ত করে।

তেমনি রাজনীতিও শুরুতে তাঁর জীবনে আসে নি কোন তত্ত্বের চকচকে মোড়ক নিয়ে। সাধারণ মানুষের দৈন্যের জন্য দায়ী বৃটিশ সরকার—এ ছিল তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ। তাঁর নিজ থানা বোয়ালখালী বিশ শতকের শুরুতে ছিল সূর্যসেন আর তাঁর সহকর্মীদের প্রশিক্ষণের এলাকা। কল্পনা দত্ত সহ অনেকে এই থানার অধিবাসী ছিলেন। আর জেলা পর্যায়ে যতীন্দ্রমোহন সেনের নেতৃত্বে চলছিল বৃটিশ-বিরোধী গণ-প্রতিরোধ। এই জোয়ারে রমেশ শীল আপনিই মিশে ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সভায়, মিছিলে, কারাগারে। পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর রাজনীতিতে যুক্ত করল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। তাই, রমেশ শীলের রাজনৈতিক সাহিত্যচর্চার উপাদান ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যেই।

আবার লোককাব্যের সুর তিনি আয়ত্ব করেছিলেন শৈশবেই। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও সমুদ্র-মেখলা অরণ্য-কুন্তলা চট্টগ্রাম ছিল চারণের ছড়ায়, বাউলের গানে, বৈষ্ণবের কৃষ্ণনামে, নারীকণ্ঠের হাঁওলায়, মহররমের জারীতে আর মাঝির ভাটিয়ালী সুরে উন্মনা। রমেশ শীলের ধমনীর মধ্যেই পল্লীবাংলার এই সুরের রেশ ছিল।

রমেশ শীল ছিলেন ব্যঙ্গ-রসিক মনের অধিকারী মানুষ। তাঁরই একজন সহকবির ভাষায়,

> 'রমেশের রসিকতায় হাস্যের নাই অবধি।
> কাইমবাজা বাজাইত হস্তে লইয়া যদি।
> মধ্যে মধ্যে মান দিত কমিকের সুরে।
> শ্রোতার আনন্দ বৃদ্ধি হইত যাহার জোরে।।' ৩৮

রমেশের বিবিধ রচনা এই ব্যঙ্গ-রসিক মনের ফসল।

চার ॥ রচনা-পরিচয়

কবিয়াল রমেশ শীলের মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা বাইশ।

মুদ্রিত রচনায় অধ্যাত্ম বিষয়ই প্রধান। মাইজভাণ্ডারের উপর রচিত হয়েছে "ভাণ্ডারে মাওলা" (৪৩ টি গান), "আশেক মালা" (৪২ টি গান), "শান্তি ভাণ্ডার" (৪১টি গান), "নুরে দুনিয়া" (৪০ টি গান), "সত্য দর্শন" (৪২ টি গান), "জীবন সাথী" (৩৭টি গান), "মুক্তির দরবার" (৩৮ টি গান) ও "মানববন্ধু" (৪০ টি গান)। কাউখালীর পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রমেশ শীলের পুস্তকের নাম "এস্কে সিরাজিয়া" (২৪টি গান)। তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানের সংকলন হল "বিচ্ছেদ তরঙ্গ বা হরি সংকীর্তন" (৪৫টি গান)।

রমেশ শীলের দেশাত্মবোধক রচনা সংকলনের সংখ্যা আট। এগুলো হল "দেশের গান" (৩২ টি গান), "ভোট রহস্য" (পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত); "পাকিস্তান সঙ্গীত" (১২ টি গান), "দেশ দরদী গানের বহি" (১০ টি গান), "শীল সমিতির কবিতা" (৭টি গান), "লোককল্যাণ" (১৪ টি গান), "তুফানের কবিতা" (৩টি গান) ও "বদল্‌তি জমানা" (৯ টি গান; বেদুঈন ছদ্মনামে লিখিত)।

রমেশ শীলের রচিত লোকগীতির একমাত্র সংকলন "চাটগাঁয়ের পল্লীগীতি" (১ম ও ২য় ভাগ; মোট ৫১ টি গান)। তাঁর বিবিধ-বিষয়ক রচনার সংকলন হচ্ছে "মহাবাক্য" (৪ টি গান) ও "ভণ্ডসাধুর কবিতা" (৩টি গান; ঋষিভক্ত ছদ্মনামে লিখিত)। এ ছাড়া রমেশ শীলের প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী সহযোগে রচিত "গান্ধীহত্যার কবিতা"।

এছাড়া কবির জীবিতকালে মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় নিম্নোক্ত পুস্তকাবলীর নাম পাওয়া যায়:

"আত্মতত্ত্ব" বা "আশেকমালা" (৩য় ভাগ); "চট্টল পরিচয়"; "চাষীর গান"; "বিধবা বিবাহ বা সমাজ রহস্য"; "বার আউলিয়ার কবিতা"; "দেশ পরিচয়" ও "সত্য দর্শন"। কিন্তু এগুলির কোন মুদ্রিত কপি কিংবা মুদ্রিত হয়েছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নিজস্ব পুস্তকের বাইরে রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ গান ও ছড়ার সংকলন "লোকগীতি" (এপ্রিল, ১৯৬৪) প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে (সংকলিত গানের সংখ্যা ১১৩ টি)।[৩৯] কলকাতা হতে কিছুদিন পূর্বে (এপ্রিল, ১৯৭৮) প্রকাশিত হয়েছে "গণ কবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান" (মোট ১০১টি গান সংকলিত হয়েছে)।[৪০] সংকলনদ্বয়ে কয়েকটি অগ্রথিত রচনা থাকলেও মূলতঃ গ্রন্থ-মুদ্রিত গানই এতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

শেষজীবনে রমেশ শীল এক পত্রে দুঃখ করে লিখেছিলেন, "···আমার অনেক ছড়া গান ছাপা হয় নাই। টাকার অভাবে ছাপান গেল না। ···কি জানি আমার জীবদ্দশায় হয়ে ওঠে কিনা।"[৪১]

জীবদ্দশায় কবির সাধ পূর্ণ হয়নি, মৃত্যুর পরেও নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রমেশ শীলের গৃহ ভস্মীভূত হয়েছিল। দৈবক্রমে পাণ্ডুলিপির যে কয়েকটি খাতা রক্ষা পেয়েছে, তাতে কবিয়ালের অগ্রথিত রচনার সংখ্যা শতেরও কম। তার একটি অংশ (৪৩ টি অপ্রকাশিত কবিতা) সম্প্রতি 'পাণ্ডুলিপি'তে প্রকাশ করা হয়েছে।[৪২] অন্য একটি অংশ এখানে পত্রস্থ করা হল। এই অংশটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, কিন্তু কবি প্রদত্ত চিহ্ন অনুযায়ী অনুমিত হয় যে এগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পাঁচ ।। অগ্রথিত-রচনাপ্রদর্শনী

[সংকলক সংগৃহীত কবিয়ালের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত পুস্তকের ভিত্তিতে পুস্তকাকারে অগ্রথিত রচনার এই গুচ্ছ প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্ভাব্য সতর্কতার পরও পুস্তকাকারে প্রকাশিত কোন রচনা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুধীজনকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বলা বাঞ্ছনীয় রচনামুদ্রণে আধুনিক বানান ব্যবহার করা হয়েছে।]

বিষয়-অনুসারে রমেশ-রচনাবলীকে চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়,

(ক) আধ্যাত্মিক,
(খ) দেশাত্মবোধক,
(গ) লোককাব্য,
(ঘ) বিবিধ।

এখানে প্রকাশিত গীতিগুচ্ছে লোককাব্য ছাড়া অবশিষ্ট তিন রকমের রচনাই বর্তমান।

ক ।। আধ্যাত্মিক :

এখানে পত্রস্থ ১-৩ সংখ্যক রচনা মাইজভাণ্ডারের পীরের উদ্দেশ্যে এবং ৪-১১ সংখ্যক রচনা চট্টগ্রামের সাতগাছিয়ার জনৈক পীর সুলতানপুরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

[১ গান তাল দাদরা]

ওরে মানব ঠিক মানব হও, হিংসা নিন্দা ছেড়ে।
(ওরে মানবরে) আদম হতে বিচার কর, তবে মানব হতে পার
এই দুনিয়া কেবা সৃষ্টি করে।
হাদিস কোরাণ সাক্ষী, কীট পতংগ পশু পক্ষি
নানা জাতি সৃষ্টি কর তারে।।
(ও মানবরে) প্রথমে এক ছিল, এক হতে দুই জন্মিল
আদম ছিল হাওয়া হল পরে।
বেণু বেচু পরোয়ার, শরিক ছিলনা তার
হাবিবকে বানাইল নিজ নুরে।।
সেই নূরে জগত হল, হিংসা কারে করি বল
হিন্দু মুসলিম সকলি ঐ নূরে।
মানুষ মাত্র আদমজাত, তাতে কিছু নাই তফাৎ
হিংসা চুনায় ভাণ্ড বরবাদ করে।।
(ও মানবরে) মৌলভী মওলানায় কয়, যেই ঘরে কুকুর রয়
ফেরেস্তা ঢুকেনা সেই ঘরে।
মানবদেহে ফেরেস্তার, সাধ্য নাই আর ঢুকিবার
হিংসা কুকুর যদি রয় শরীরে।।
চিস্তিয়া তরিকা মতে, হালকা জিকির তাল যন্ত্রেতে,
যায়েজ নয় যারা বলে জোরে।
সুদখোর বাড়ী দাওয়াত পেলে, মাছে গোস্তে বেশী খাইলে
এই যায়েজখান বুঝায় যারে তারে।।

(ও মানবরে) ওয়াইজ নছিয়তে গেলে, মাইজভাণ্ডারের বদনাম তোলে
ইটচ্ছামত হিংসার ভাণ্ড ঝারে ।।

[২]

ঘরে বসে রইলি কার আশায়
ঐ যে আমার বন্ধুর বাঁশী শুনা যায়।
বাঁশীতে কি মোহন সুরে প্রাণ কেড়ে লয় কে যাবিরে আয়রে আয় ।।
মোহনী জানে, কুলমান বিসর্জন দিয়া প্রাণ ধরে টানে,
আমার বন্ধুর বাঁশী মন উদাসি বাজে বুঝি অনিচ্ছায় ।।
থাকে বন্ধু ঢাকা শহরে, সাধ করে করেছে বাসা আদমনগরে,
ঢাকার ঢাকা উল্টে গেলে ত মন তারে দেখা যায় ।।
ঢাকা শহর অতি মনোহর চার কাহারি নয় পরগণা মধ্যে বন্ধুর ঘর,
বন্ধু মধ্যে মধ্যে উঁকি মারে মেঘেতে বিজলির প্রায়।
রমেশ বলে বিনয় বচনে, শব্দ উদ্দেশিয়া চল বন্ধুর সদনে,
শুনে বাঁশীর ধ্বনি ভাব তরণী প্রেম যমুনায় উজান যায় ।।

[৩]

চিন্তা কিরে কলির জীবের ত্রিতাপ জ্বালার ঔষধ আছে,
মূল কবিরাজ দয়ালগুরু খোজ করে চাও গুরুর কাছে।
মহামন্ত্র বটি নিয়া, করল অণুপান দিয়া
ভক্তি মধুতে মিশাইয়া খেলে জটিল রোগী বাঁচে।
উপসর্গ দশ ইন্দ্রিয়, দুই রিপু কুপথ্য প্রিয়,
তারে অন্তরমুখী করে নিও, সব যন্ত্রণা যাবে ঘুচে।
কামে চায় কামিনী কোলে, ক্রোধে চায় কলহ তোলে,
লোভে কয় মাছ মাংস ঝোলে, খেলে তবে পরাণ বাঁচে।
মোদের হল অহংকার মূল, মোহবেটা রূপে আকুল,
মাৎসর্য্যের ঘটে চক্ষু শূল পরশীতে বুক জ্বলতেছে।
রিপুর ফট ফটানি হতে, ইচ্ছা যদি মুক্তি পেতে,
চেতন গুরু ব্যবস্থাতে, সব যন্ত্রণা যাবে ঘুচে ।।

[৪ গান তাল কাহাঁরবা]

শুন বন্ধুগণ বড়পীরের আশনের বিবরণ।
ভক্তিভাবে হাজির হলে সর্বদুঃখ হয় মোচন।
সুলতানপুরি কাজি বংশ পীর গোর বুজর্গান,
পুরুষানুক্রমে আছে এই আসনে বর্তমান,
কামালিয়ত হাসেল করে করে এই আসন রক্ষণ।
জগতের হিত করিবারে মনে করে কামনা,
শতে শতে এতিম এনে খুলেছে এতিমখানা,
হাফেজ মৌলভি মাওলানা হয়ে যাচ্ছে এতিমগণ।
বড় পীরের আসনের পার্শ্বে পীর বুর্জগের মাঝারে রয়,
নিয়তে করিলে মানত হাতে হাতে সিদ্ধ হয়,
কত রুগী আহাল হল কে করে তাহার গণন।

কামেল বিনে সেই আসনে বসতে কারও সাধ্য নাই,
মনে প্রাণে বিশ্বাস হবে দেখনা দরগাহে যাই,
আওলাদে পাক আবুল বাবা করে ফয়েজ বিতরণ।
রমেশ বলে সেই দরবারে দিবা নিশি যেতে চাই,
ঘাটে এসেছে নৌকা ভাগ্য মন্দ বেলা নাই,
রঙ্গরসে সময় কাটাই শেষ দিনের নাই আয়োজন।।

[৫ গান তাল আদ্ধা]

ও দরবারী ভাই মনকেরের তামাসা দেখনি,
(তারার) আসেকিরে নিন্দা বিনে পেটের ভাত হজম হয়নি।
জাহেরি এলেম হেজার হয়, এই কথাটা মিথ্যা নয়,
মসনবি কিতাবে কয়, মওলানা রুমির বাণী।
ভ্রমর ফুলের মধু খায়, মাছি বিষ্টার দিকে যায়,
দুইজনকে বানাইল খোদায় দুই জিনিস তার আমদানি।
আসেকিরা হালকা করে, তাঁদের চোখে কুটা পরে,
হাল্‌কায় কি ফজিলিয়ত বাড়ে হিয়ান তারা জানেনি।
ছেমাতে যার মনে সন্দহ্‌, নিশ্চয় তার ভাগ্য মন্দ,
সূর্যালোকে পেঁচা অন্ধ, আমরা তা আগে জানি।
ছেমা করি ওফাত হলে, রোয়াজা হয় দরবার মিলে,
লাখে লাখে বাত্তি জ্বলে, তারার কিছু জ্বলেনি।
কোরান হাদিছ কিতাব পড়ে, নায়েব নবি টাইটেল ধরে
হিংসা করা কোন কিতাবে পাইল তারা কি জানি।
তারা খুশি হিংসা করি, আমরা খুশি গুরু ধরি,
রমেশ বলে শুলতানপুরি বিনে কিছু না চিনি।

[৬ গান তাল দাদরা]

এক মুখে কি বলব আমি সুলতানপুরির গুণের কথা,
পবিত্র বংশ যফুর আছে যথা তথা।
বংশ পরম্পর হতে, আছে বড়পীর আসনেতে,
চার তরিকা প্রকাশিতে তিনির মত কে কৈ কোথা।
বনের পশু বাঘ ভল্লুকে, তান কদমে মাথা রাখে,
জীন পরি হুর সবাই ডাকে রাত্রে আসে দেব দেবতা।
নিজে ধরা দেয় না যারে, সে চিনিবে কেমন করে,
চান সুরুজ সবার উপরে আজ তান অসীম ক্ষমতা।
আবুল বাবা দিনে রাতে, ফয়েজ বিলায় রুহানিতে,
কেহ ফিরবেনা খালি হাতে বুঝিলে রমেশের কথা।

[৭ গান তাল আদ্ধা]

আশেকের নয়ন মণি ওরে দয়াল সুলতানপুরি,
বাবা তোমার রহমতে, পার হয়ে যায় শত শত,
আমি এলাম শেষ বেলাতে পার করে দাও ত্বরা করি।

আমার শেষে এল যারা আগে পার হল তারা,
কদম নৌকায় হুকুম ছাড়া আমিত উঠতে নারি।
ছিল যার ভক্তির পুঁজি পার কাণ্ডারী করল রাজী,
জানি তুমি দয়াল মাঝি আমারতো নাই টাকা কড়ি।
কড়ি ছাড়া সর্বহারা, শেষ খেয়ায় পার হবে তারা,
একটু জায়গা আর ইশারা না দিলে মুই প্রাণে মরি।
সন্ধ্যা হল রয়েছি বই, আর খেওয়া নাই পার হলাম কই,
রমেশ আছে এক আশ লই বুঝতে মাঝির ছলচাতুরি।।

[৮ গান তাল দাদরা]

আমায় পাগল করে কান্দাইতে এই ছিল কি তোমার মনে,
জ্বলে পুড়ি ছাই হয়ে যায় তোমার প্রেম বিচ্ছেদ আগুনে।
একি ভালবাসার ফল, গোড়া কাটি আগাতে জল,
হলাম আমি পথের পাগল মোহনরূপের আকর্ষণে।
শমসের তবরেজ চামড়া দিল, দুরমদ নিজে কতল হল,
মুছা নুরি মুর্চ্ছা গেল, তোমার ঐ রূপ দরশনে।
মনছুর উঠে শুলের পরে, জাকারিয়ার মাথা চিরে,
খলিল পুত্র জবাই করে, একমাত্র তোমার কারণে।
গাউচ বাবা সুলতানপুরি, জুদাই দুঃখ সইতে নারি,
রমেশ কয় আর কত পারি মরি তোমরা অদর্শনে।।

[৯ গান তাল গৌর খেমটা]

চঞ্চল মন তুই পাগল হয়ে তালাস কর কার,
সেইত বসে মুচকি হাসে তোর হৃদয় মাঝার।
আঠার হাজার মকলুকাতে, সেইত আছে সব জাগাতে,
অখণ্ডকে খণ্ড করে ভণ্ডামি তাহার।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবাই চালক আছে যারা,
হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান বৌদ্ধ নাই তার ভেদ বিচার।
রিপুর ফেরে মায়ায় ঘোরে, চিনতে ঠেকা সেই বন্ধুরে,
হাশর ময়দান ছেরাত পারে বন্ধু নাইরে আর।
তার যাহের বাতেন, দুই মুরতি বুঝে দেখ,
মন মন্দ মতি, ছুয়াল জাহের ছুয়াল বাতেন শুদ্ধ কালাম তার।
পীর চিনিলে তারে চিনে, বিনা মূল্যে হীরা কিনে,
রমেশ কয় সে এই ভুবনে শুদ্ধ ঈমানদার।

[১০ গান তাল গৌর খেমটা]

ভরসা নাই ভরসা নাই তুমি গুরু বিনে,
তুমি অগতির গতি, তুমি সুখদুঃখে সাথীরে ও গুরু
চরণ তলে স্থান দিও অধীনে।

মোরে দুনিয়ায় বিদায় দিলে কাঁচা মাটির পরে,
গেলেরে ও গুরু মনকির নকির পুছিবে যখনে।
সেই ছোয়ালের জবাব দিতে, তুমি থাকবে আমার সাথেরে,
ও গুরু আর্জি করি রাখি সেই কারণে।
আর এক সংকটের দিন কেহ কারে দিবে না চিনরে,
ও গুরু পুলছেরাত পার হব যেই দিনে।
আমি পথ হারাই বিপথে গেলে, ইশারা দিও সেই কালেরে,
ও গুরু বান্দব নাই আর আমার দোজাহানে।
রমেশ কয় যে যারে চিনে, পরাণ দিলেও তারে কিনে রে,
গুরু আমার পরিচয় হলনা গুরু সনে॥

[১১ গান তাল এক তালা]

মানবজনম গেল বিফলে,
গুরু সাধনা হলনা মোর কপালের ফলে।
যৌবনে ন করি সাধন কি করি বুড়া কালে।
তরুণ বয়সে গায়ের যোশে হেড-উচল ভেদ নাই,
যৌবনে রমণী আছিল সকল সুখের ঠাঁই,
এখন বল বুদ্ধি সকল হারাই কি হবে মোর শেষ কালে।
যেই বাহুর বলদর্পে লোক, ভয়ে জরসর,
সেই বাহু মোর লাঠি ধরি কাঁপে থরথর,
আমারে আমি দেখিনা, আয়না ধরি মুখ চাইলে।
যৌবন কালে ছিল আমার দোস্তের হাট বাজার,
এখন সাতবার ডাকি দেখা না পাইর কি ভাগ্য আমার,
চলন শক্তি রহিত হল কি উপায় আজরাইল আইলে।
রমেশ কয় হুননি ভাই সুলতানপুরির নাম,
এক পলকে করে দিবে ষাইট বছ্ছরের কাম,
বড়পীরের বদলা দেখবা হাতগাছিয়া দরগায় গেলে।
চিলর ঝাপটায় মুরগীর বাচচা পাখা দি ঢাকিব,
আবুল বাবা মুরিদরে তদ্রুপ রাখিব,
যদি পীর মুরিদে এক হৈ যাইব আজরাইলে কাকে নিব ন পাই॥

খ ॥ দেশাত্মবোধক :

রমেশ শীলের দেশাত্মবোধক রচনা বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এখানে পত্রস্থ রচনাগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ-বিরোধিতা (১৪), সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ডাক (১৫, ২৭), ভাষা আন্দোলনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য (১৬), শিক্ষা সংকট (১৭, ২০, ২৬), বিধবার বেদনা ও নারীর অধিকার (১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬), কৃষি ও কৃষকের সংকট (২৩), অর্থনৈতিক বৈষম্য (১৯, ২১), ১৯৬৪-র নির্বাচন (২৮, ৩০), পরিবার পরিকল্পনা (২৫), চট্টগ্রামের বন্যা (২৪), ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ (৩১, ৩২), আইয়ুব খানের কুশাসনের প্রতিবাদ (৩৩), মানবতার জয়গান (২২), মওলানা ভাসানীকে অভিনন্দন (২৯) প্রভৃতি বিষয়।

এখানে তাঁর দেশাত্মবোধক রচনাগুলি কালানুসারে [৩৪-৩৬ ছাড়া] গ্রথিত করা হয়েছে।

[১২ দেশপ্রেমমূলক গান তাল কাহারবা]

উজান বেয়ে চলরে মাঝিভাই সব উজান বেয়ে চল।
ঐ দেখা যায় রঙ্গীন সূর্য রক্ত উজ্জল ।।
প্রথমে বাংলাদেশ আবাদ করল যারা।
ঝড় ঝাপটা অতিক্রম করে চলে গেছে তারা।
শ্বেতাংগ হাতে তারা হয়ে নির্যাতিত।
বাংলাদেশে বাংলার ছেলে গেল শত শত।
মাঝি উজান বেয়ে চল।
এখন দু'হাতে তুলতেছি তাদের বীজ বোনা ফসল ।।
দেশকে যারা ভালবাসল মাতৃভূমি বলে।
রাজদণ্ড জয়টিকা আঁকা তাদের ভালে ।।
পাষাণ কারা ভাসাইল দিয়া মাথার ঘাম।
ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখা আছে নাম।
মাঝি উজান বেয়ে চল।
তাদের অসম্পূর্ণ কাজের জন্য ছুটে আয় সকল ।।
সোনার বাংলায় সোনার ধান ফলিত প্রচুর।
পাল পার্বনে হিন্দু মুসলিম আনন্দে ভরপুর।
সেই জমি নষ্ট করে আবর্জনায় ঘেরি।
উপবাসে মরে হিন্দু মুসলিম নরনারী।
মাঝি উজান বেয়ে চল।
এখন দুহাতে উপরি ফেল যত আগাছা জঙ্গল ।।
আজ আমরা এক হয়েছি হিন্দু মুসলমান।
সবার সংগে মিলিয়ে গলা গাইতে হবে গান ।।
মোদের আগে আগুন নিয়ে করায় যারা খেলা।
সেই আগুনে মৃত্যুদণ্ডে করব অবহেলা।
মাঝি উজান বেয়ে চল।
সেদিন হবে পল্লী কবির সাধনা সফল ।।

১৯-১১-৪০, কলিকাতা।

[১৩ গান তাল দাদরা]

প্রাণ দিয়ে ভাই খাটতে হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে,
আমার দেশের ভাইবোন না বাঁচিলে আমি বাঁচি কোন দরকারে।
খাদ্যনীতি, সমাজনীতি, ভিন্ন থাকুক তায় কি ক্ষতি,
আমরা বাঙালী জাতি বিজাতি ভাবিব কারে।
নর ঘটে নারায়ণ, কোরাণ পুরানের বচন,
নর সেবা করে যেইজন, একদতি কই তাহারে।
রসুল আল্লাহ সহি হাদিসে, মানবের সেবা প্রকাশে,
মানবকে যে ভালবাসে, খোদা ভালবাসে তারে।
একতা সহনশীলতা, এই আমাদের প্রাণের কথা,
বাঁচাব দেশের জনতা, পরস্পর প্রচেষ্টা জোরে।

১৮-৬-৪৩, গোমদণ্ডী।

[১৪ ছড়া বৃটিশ অত্যাচারী]

অত্যাচারী দল জুলুমবাজ সকল অচিরে হইবে নাশ,
এ দুঃখ ভাবিয়া বিপ্লবী হইয়া কত যুবকের কারাবাস।
এক মুঠ অন্ন তরে গিয়া তোদের দ্বারে কান্দিয়া মরেছে যারা,
তোদের চক্রে পরি সেজেছে ভিখারী জাতভিখারী নয় তারা।
প্রাণের আশায় প্রাণ নাহি চায়, তোরা কি বুঝিলি তাহা,
রুক্ষভাবে দুঃখ দিলি বেটা মুর্খ পশুতে করেনা যাহা।
ব্যবসার ছলে আসিয়া একুলে ডাকাতি ব্যবসা নিয়া,
ভৃত্য হইলি রাজপথের মালিক লোকের চক্ষু ধুলা দিয়া।
পরের ধনে দেখি অলপদিনে সাজিলি সওদাগর,
পোশন তুলিলি শোষণ করিলি বসায়ে নানা কর।
অন্ধকুপ হত্যা কলংক চাপালি, নিষ্কলংক লোক শিরে,
আসিবে একদিন বিচারের সময় সুদ-আসল হিসাব করে।
রাশিয়ার জার মহা অত্যাচার কৃষকেরে করিয়াছিল,
সকল মিলিয়া বিপ্লবী হইয়া মাথা টিপিয়া দিল।
সেইরূপ ভারতে হিন্দু মুসলিমেতে যেইদিন এক হতে পারে,
সেইদিন বুঝিবি প্রতিফল পাবি শোষণ করেছিস কারে।।
৮-৯-৪৩, চট্টগ্রাম।

[১৫]

ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি কি সুখের আশায়,
হিন্দুস্থান কি পাকিস্তান বিবাদে পাওয়া যায়।
বিলাতে শ্রমিকদল যত, সকলে হয়ে মিলিত,
এসেরি দল পরাজিত, করে আইন সভায়।
একতা মহামন্ত্র, ধ্বংস করে ধনতন্ত্র, কায়েম হয় গণতন্ত্র,
কেবল একতায়।
মোদের যখন বিবাদ মুঠে, সামরাজ্যবাদ মজা লুটে,
চোখ থাকতে দেখি না মোটে, জন্ম অন্ধ প্রায়।
সারা দুনিয়ার লোকে, সকল প্রগতি মুখে,
ভারতের লোক অন্য দিকে, যাচ্ছে কোন কথায়।
এখনও মংগল চাও, ভাইয়ের পাশে ভাই দাড়াও,
একযোগে দাড়ালে হবে সব দাবী আদায়।।
৮-১০-৪৪, কলিকাতা।

[১৬ ভাষার গান]

স্মরণীয় দিন বাঙালীর স্মরণীয় দিন।
রমনার মাটি ছাত্র রক্তে লাল হয়ে গেল এই দিন।।
যত হিংসুকের দলে, মাকে ছাড়ি বিমাতাকে মা ডাকতে বলে।
আমরা নিজের মাকে মা ডাকিলে তাঁরা করে মুখ মলিন।।
ছাত্ররা দাবী জানাইল, কোন পরানে কচি বুকে গুলি চালাইল।
তেমনি দুষ্যকার্যের ফল ফলিয়া শক্তিবান হইল শক্তিহীন।।

শুন ভাই-ভগিনীগণ, বাঙালীর বাংলা ভাষা মার দুধের মতন।
ভাষা গেলে জাতির মরণ, জল গেলে বাঁচেনা মাছ ।।
ভাষা জাতির মহাধন, মুখের ভাষা রাখতে যারা দিয়াছে জীবন।
এই শহীদ স্মৃতি রাখব স্মরণ দেহে জীবন যতদিন ।।

১০-৫-৫২, গোমদণ্ডী।

[১৭ ছাত্র দেশের ভরসা]

ছাত্ররা মুক্তি সেনা, অস্বীকার করা যায় না,
ছাত্ররা দেশের হিতৈষি।
স্বাধীন মনোভাব নিত্য, সর্বদা নির্ভীক চিত্ত,
ছাত্ররা দেশের শান্তির প্রত্যাশী।
স্বাধীনতায় ছাত্র আগে, আন্দোলনের পুরোভাগে,
সবাইর পক্ষে ছাত্র ভবিষ্যত।
আন্দামানের বন্দী মুক্তি, ছাত্রদের অতুল কীর্তি,
সর্ব কাজে উদ্দেশ্য মহত।
অন্ধকুপ হত্যার কথা, ছাত্র প্রাণে লাগে ব্যাথা,
সেই কলংক ছাত্ররা ঘুচায়।
ছাত্র দেশের প্রিয়, সকলের আদরণীয়,
নতুন দিনের উজ্জ্বল আশায়।
জাতির সংকট মুহূর্তে, ছাত্র অগ্রণী তাতে,
ভাষা আন্দোলন তার প্রমাণ।
কেপ্টেন রসিদালি মুক্তি দিতে, দাঁড়ায়ে সদর রাস্তাতে,
কদমরসুল রামেশ্বর দিল প্রাণ।
টাকা পয়সা সম্পদ নয়, মূল সম্পদ চরিত্র হয়,
চরিত্র মানবের সম্বল।
চরিত্রহীন ঘটে যেই, জগতে স্থানতো নেই,
ছাত্র চরিত্র অতিশয় নির্মল।
গরীব ছাত্র পড়া হয় না, প্রাইভেট মাষ্টার রাখা যায় না,
অভাবে গরীব ছাত্র বাড়ী।
শতকরা বিশটি ছেলে, প্রাইভেট মাষ্টার রাখে বলে,
পরীক্ষায় যেতেছে পাশ করি।
এই ভাবে লিখাপড়ায়, দেশের উন্নতি কোথায়,
দেশের লোকে কি জানি কিভাবে।
শিক্ষার আলো না জ্বালালে, জাগিবে লোক কি বলে,
অশিক্ষার আন্ধারে ঘেরিবে ।।

১০-৯-৫৩, ঢাকা।

[১৮]

অনিচ্ছায় চক্ষু বুজি, হয়েছে উচিছষ ভোজি, সমাজতার বিচার করেনা।
অর্ধেক অঙ্গ স্বাধীন হল, অর্ধেক পরাধীন রইল
এই নাকি স্বাধীনের নমুনা।

স্ত্রী বন্ধু দাসি প্রভু, এমন কি মিলে কভু,
একমাত্র নারীতে সম্ভব।
নারী পুরুষ সুমিলনে স্বর্গ সুখ তুচ্ছ মানে,
সেই ঘরে নিত্য মহোৎসব।
কল্পনা আর প্রীতিলতা, এই দুই মেয়ের কথা,
লোকে কি যাইবে কভু ভুলি।
ঠেলিয়ে সমাজের মাথা, এই দুই বীরাংগনা,
তবু দাড়াইল মাথা তুলি।
গৃহলক্ষী হয় রমণী, অবজ্ঞা করিবে যিনি,
তিনি বটে সমাজ ঘাতক।
সংসারে রমণী রত্ন, যে না বুঝে তার যত্ন,
সমাজে বাস করা অনর্থক।
হিন্দু মুসলিম যুবকগণ, রুখে দাঁড়াও সর্বজন,
নারী স্বাধীনতা দিতে হবে।
আন্তর্জাতিক মেয়েরাই, সকল স্বাধীন দেখা যায়,
এই দেশ কেন পিছুপা হয়ে রবে॥

২।৭।৫৪, চট্টগ্রাম জেল।

[১৯ একালের সমাজ কবিতা]

একাল সমাজ ব্যবস্থায়, অনাহারে দিন কাটায়,
পথেঘাটে গরীবের ছেলে।
যদি শিক্ষা দীক্ষা পায়, এই সকল ছেলেরাই,
আইএসসি পাশ না করবে কে বলে।
বড়লোকের ছেলেরাই, দিনে তিন বেলা টিফিন খায়,
মাছ মাংস ঘি পোলাও কত।
গরীব লোকের ছেলেরাই, পেটভরে ভাত নাহি পায়,
অস্থি মাংস সকল মজ্জাগত।
সমাজে দুর্বল যেই, মহা অপরাধী সেই,
নির্যাতন নিত্য সহচর।
তার সত্য কথা মিথ্যা হয়, মনক্ষুন্ন সব সময়,
কেহ লয় না দুঃখের খবর।
ঘুষ দিলে চাকুরি মিলে, মরুভুমে জোয়ার খেলে,
এই একালের সমাজের গুণ।
স্বাধীন স্বত্বা নিয়ে, আছে কত দুঃখ সয়ে,
কাচা বাঁশে ধরিয়াছে ঘুণ।
সমাজে গরীবের ছেলে, যেতে পারেনা স্কুলে,
মুর্খতা জীবনের সহচর।
যৌবন প্রারম্ভে প্রায়, অসৎ সংগে কাল কাটায়,
চৌর্যবৃত্তি করে নিরন্তর।
অভাবে স্বভাব নষ্ট, তার ফলে কারা কষ্ট,
বড় চোরের সঙ্গে মিশে জেলে।
সাজা শেষে বাহির হয়, ডাকাতির ব্যবসা লয়,
অশিক্ষায় এই ফল ফলে।

সমাজের নীতি দেখে, মরি আমি মন দুঃখে,
　　একালে সমাজের কর্মধারা।
নিরিহ লোক শাস্তি প্রায়, অপরাধীর সুনাম গায়,
　　গুণ্ডাদলে পুরস্কৃত করা।
কলংকিনি যারা দেশে, লক্ষ্মীর বেদিতে বসে,
　　সতী যারা পদদলিতা।
অসতের সমাজের মান, সৎ এর নিত্য অপমান,
　　কি বুঝাব এই সমাজের কথা।
ঈদ কি দশমী দিনে, মুসলমান মুসলমানে,
　　হিন্দু হিন্দুতে আলিংগন।
ধর্ম আইনের মর্ম মতে, স্বজাতির ভাইদের সাথে,
　　এই প্রথা আছে চিরন্তন।

৩-৭-৫৪, চট্টগ্রাম জেল।

[২০ শিক্ষাই আলো]

শিক্ষা জীবনের মূল, একথাটা নির্ভুল,
　　শিক্ষা শিল্প কৃষি এই তিন।
এই তিনটি উন্নতি বিনে, শান্তি নাই কোনদিনে,
　　রাষ্ট্র উন্নতি হয় না কোন দিন ।।
গণতান্ত্রিক দেশ যত, শিক্ষায় শিল্পে উন্নত,
　　অবৈতনিক বি,এ, এম,এ, পাশ,
বৈজ্ঞানিক সারের জোরে, জমি উর্বরা করে,
　　কলের লাংগল টেক্টার দিয়ে চাষ ।।
নানা শিল্পে প্রসার করে, রুজি পায় মজদুরে,
　　স্বাধীন দেশের চাল-চলন এই জানি।
আমরা স্বাধীন হয়েছি, হতাশায় দিন কাটাইতেছি,
　　তিলে তিলে জীবনের ক্ষয় জানি ।।
কোন মেধাবী ছেলে, পড়িবার ইচ্ছা হলে,
　　অর্থ কষ্টে পড়িতে না পারে।
দেশের হিন্দু মুসলিম গণে, যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যদানে,
　　আইএ, বি,এ, পাশ করান যায় তারে ।।
দশের লাঠি একের বোঝা, এই কথা বুঝতে সোজা,
　　হিন্দু মুসলিম যার ছেলে হোক ছাত্র।
এক গ্রামে দু'হাজার ঘর, একখানা সিকি দিলে বহুতর,
　　একটি ছেলের পড়ার খরচ মাত্র ।।
বহু ছেলে গরীব ঘরে, আজীবন জন্ম ধরে,
　　দৈন্যতা পীড়নে শিক্ষাহীন।
কি শিখিবে লেখাপড়া, কালে গেছে বাবা মারা,
　　অন্নভাবে সদা মুখ মলিন ।।
ছেলে যদি শহর চিনে, পেটের ক্ষুধার কারণে,
　　কোন বাবুর বাসায় চাকুরি লয়।
এটো ধোয়া আর বাসন মাজে, বাজার করে মাঝে মাঝে,
　　কৈশোর এইভাবে গত হয় ।।

তারপর যৌবন ভরপুর, গেজে বসে ক্ষেতমজুর,
সারাজীবন দৈন্যতায় ঘেরা।
তারপর সর্বহারা দলে, ভর্তি হয় দলে দলে,
স্বাধীন দেশের এইত চেহারা ॥
৫।৭।৫৪, ঢাকা জেল।

[২১ গান তাল খেমটা]

দেশের ভাইরে দেখছনি ভাই আজব দেশের কারখানা,
কেহ বেজা কেহ তাজা কেমন মজার দেশখানা।
দুইভাই হয়ে একত্তর, সাধ করে উঠালাম ঘর,
রক্তক্ষয়ের করা যায় না তুলনা।
হঠাৎ পশ্চিম হতে বাতাস এল, ঘরের চাল বেড়া উড়ায়ে নিল,
শূন্য ভিটা পড়ে রইল বসত করা হলনা ॥
বিএ পাশ করেছে ছেলে, দৈন্যতা খণ্ডিবে বলে,
পিতামাতা করে কত কামনা।
ইণ্টারভিউ দিতে যায়, পীরের সিন্নি মানে মায়,
ঘরে এসে সন্ধ্যা বেলায় কয় চাকুরি জুটল না।
সময় আছে মংগল চাও, ভাইয়ের পাশে ভাই দাড়াও
পরের উস্কানিতে কান দিওনা।
তোমার আমার বিচ্ছেদ এলে, শোষকের সুবিধা মিলে,
বুদ্ধির ভুলে যাতাকলে মাথা দিতে যেও না ॥
ভাত হলে তরকারি নাই, এমন দেশে কাল কাটাই,
দুখের কথা বুঝালে কেহ শুনেনা।
কেবল দায়ি করি কর্মফলে, এই দারুন দৈন্যতা তালে,
কি আছে তা চুক্ষু খুলে,
কেহ কোন দিন দেখল না ॥ ১৮।৯।৫৫, চট্টগ্রাম।

[২২ আদর্শ মানব ছড়া]

মানব দানব উভয় একাকার গুণ কর্মে পরিচয়
হাত-পা বিশিষ্ট মানব আকৃতি প্রকৃতি মানবের নয়।
নিজ স্বার্থ আদায় করিতে পর পীড়া দানে যেই
মানব রূপেতে জন্ম নিল ভূতলে প্রকৃত দানব সেই।
মিথ্যা যার জীবন সহচর মিথ্যায় পুলক গাঁথ
পরশ্রী কাতর থাকে নিরন্তর হিংসা পরিপূর্ণ চিত্ত।
মুখে মিষ্ট বুলি অন্তরে গরল পর দোষে দৃষ্টি রাখে
ক্ষমা শূন্য হৃদয় তাহার কলহে আনন্দে থাকে।
মানুষ হইয়া মানুষের উপর যেবা করে অত্যাচার
বসুন্ধরা অনিচ্ছা সত্ত্বে বহিছে তাহার ভার।
মানবে সম্ভবে যোগী ঋষি মুনি আউলিয়া আম্বিয়া যত
রামকৃষ্ণ যিশু বৌদ্ধ মহম্মদ সকল মানুষের মত।
মানব কল্যাণে জগতের হিতে নির্যাতন নিপীড়ন সহি
মানব আদর্শ স্থাপন করিল মানবের নীতি কহি।

মানব সবাই যেন ভাই ভাই কেহ নহে কারো পর
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য তারে সংসারে করেছে ঘর।
সত্য বিচ্যুত হয়না কখন সত্য পরম ধন
তুচ্ছ প্রাণ রাখিবে সত্য সকল দিয়ে বিসর্জন।
সত্য মানবের জীবনের সাথী সত্য মানব রক্ষী
সত্যাশ্রয়ীর ঘটেনা পতন ইতিহাস তার সাক্ষী।
সহনশীলতা ধর্ম বিশ্বাসী ত্যাগ ব্রতী সর্বদাই
মানব প্রেমিক মানব কল্যাণে জীবন কাটিয়া যায়।
সৎ উপদেশ দান সৎ কাজে রত সদা সদালাপী যেই
মানব সমাজে মানবের সাজে প্রকৃত দেবতা সেই ॥
৭।১১।৫৫, নিজবাড়ী।

[২৩ কৃষি অবস্থা]

সুজলা সুফলা মোদের পূর্ব পাকিস্তান
শতকরা আশিজন কৃষক হিন্দু মুসলমান।
তিনতনু কৃষভার দেহ ছিন্ন ভাতে
কন্টক কাঁপে দেহ কাপড় নাই শীতে।
কাঁচামালের যোগানদার এই কৃষকদল
দেশের মেরুদণ্ড কৃষক মজদুর সকল।
এক বাক্যে সকলে বলে সদা শুনতে পাই
কাজে দেখি সুনজর সেই দিক কারো নাই।
বিদেশি শিল্পেতে দেশ ভরপুর হল
প্রতিযোগিতাতে দেশের কারিগর হটিল।
ধনীরা মুনাফা করে যাদের কাঁচামালে
বিলাসের সামগ্রী হয় যাদের শ্রমের ফলে।
তিলে তিলে মরে তারা পেটে অন্ন নাই
রোগশয্যায় গড়ায় তারা ঔষধ নাহি পায়।
দাতব্য চিকিৎসালয় গ্রামে গ্রামে হয়
রোগী গেলে বাহির হতে ঔষধ কিনতে কয়।
এগ্রিকালচার অফিসেতে পাবে বীজ ধান সার
চিন্তা করে কেবা দেখে কিছু চাষার।
সারের জন্য গেল চাষা অফিসারে বলে
সারের ষ্টক খালি এখন আবার এলে পাবে।
এই সব গরিমসি কৃষকের দিন গত
দুঃখী জীবন নিয়া চাষি আর পারে কত।
তেভাগা আন্দোলন চাষারা করিল
দিনাজপুরের চাষিগণে কতকষ্ট পাইল।
জমিদার চাষি মারতে সরকারের আশ্রিত
শিবরাম সমিরউদ্দিন দোহার জীবন হত।
আধিবর্গা প্রথা চলে পূর্ব পাকিস্তানে
ঘাস বিছালির ভাগ পায়না বর্গা চাষাগণে।
ধানের আধা ঘাস বিছালি মালিকে সব রাখে
মালিক বুঝে চাষির বলদ বাতাস খাই থাকে।

বলদ দুইটা দেখতে যেন অস্থি চর্মসার
এই কৌশলে চাষি ধ্বংস পূর্ব বাংলার।
উন্নয়ন হবে দেশের পত্রিকায় যায় শোনা
ভেবে দেখুন উন্নয়নের কি সুন্দর নমুনা ।।
১৫।৮।৬১, গোমদণ্ডী ।

[২৪ গান তাল ঠুমরী]

কি দারুন বন্যা দেশে আসিল, দেশ জ্বালাইল ।
এক সংগে নয়টি থানা জলের তলে ডুবাইল ।।
দেশ জ্বালাইল।
বেরাজ্যা সাজিল মানুষ ঘর বাড়ী হারাই আরও গরু ছাগল নাই।
বীজধান বলদ ঘরের কথা মেম্বারদের জানাইল ।।
দেশ জ্বালাইল।
মরাগরু পাইলে শকুন যেমন খুশি হয়, তেমন মেম্বার মহাশয়।
মনে মনে মেম্বারে কয়, এই সুযোগ খোদায় দিল ।।
দেশ জ্বালাইল ।
যার জন্য আসিল সেত নাহি পায়, বেশির ভাগ মেম্বারে খায়।
গরীবের হক বড় মানুষ খায়, ভোটে এই ফল ফলিল।।
চোখে দেখল সবে বন্যার কাণ্ডের গুণ, যেমন কাঁচাবাশের ঘুন।
হুশিয়ারে ভোট দিবা ভাই, সামনে আবার ভোট এল ।।
১৭।১০।৬২, গোমদণ্ডী ।

[২৫]

শুনছনি ভাই শুনছনি, পত্রিকা খান পড়ছনি
পরিবার পরিকল্পনার খবর পাইছনি ।
রোজগারে খরচ না সারে, কে যোগাইব ভাত পানি ।।
ভাবিয়া করিলে কর্ম সুখের লক্ষণ, না ভাবি কাজ করলে ঘটে পশ্চাতে শোচন।
ডাক মহাপুরুষের বচন ভাবি চিন্তি চাইছনি ।
পুত নাতিতে ঘর ভরাই ঘরে জায়গা নাই
রোজগারে খরচ না সারে এখন কি উপায়।
ঈমানদারী কথা কও চাই পেট ভরি ভাত খাইছনি ।।
বাঘের একটা বাচচা হইব বার বছর পর
হেই দরোয়াপ উঠি গেছে মানুষের ভিতর।
মাইন্সর বাচচা বছর বছর কিয়ে পাইয়ে কি জানি
মানুষের দুর্গতি দেখি গর্ভর্ণমেণ্ট কয়
জন্মনিয়ন্ত্রণ বিনে থামান যাইত নয় ।
যদি আইনের বাঁধন শক্ত না হয় ডাক দোহাই মানিবনি
পাকিস্তানী ভাই ভগিনি হুঁশে চলিবা
যে দিকে শান্তি মিলে সেই দিকে যাইবা ।
যদি ইসারাতে না বুঝিবা ভাংগি কইলে হৈবনি ।।

[২৬ দেশপ্রেমমূলক শিক্ষা সংকট]

প্রাইমেরী শিক্ষার মাথা, আইএ বি এ পরের কথা,
দেশে কেহ ভাবিয়া নাহি চায়।
যেই দিকে ফিরে চাই, শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত নাই,
দেশের লোকের হবে কি উপায়।।
প্রাইমেরী স্কুল যত, চলেনা আর রীতিমত,
মাস্টারের বেতনে না পোষায়।
প্রাতশয্যা ত্যাগ করি, করতে যায় প্রাইভেট টিচারি,
ঘরে ফিরে রাত দশটায়।।
একেত অল্প মাহিনা, মাসান্তেও পাওয়া যায় না,
স্কুল চালায় উপবাসে থাকি।
শিক্ষা বেচে স্কুল চলে, এই কথা সকলে বলে,
সেই আশায় বসে কয়দিন থাকি।।
প্রাইমেরি মাস্টারে, খরচ সামলাতে নারে,
কেমনে ছেলে পড়াবে আর।
পেটের জ্বালায় দুই বেলায়, লোকের বাড়ী বাড়ী যায়,
মধ্যাহ্নে হয় স্কুল চকিদার।।
লংকা লবণ মাছ তরকারি, সকল দুর্মূল্য হেরি,
ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে গিয়াছে।
বিপ্লবী সরকারে, শিক্ষার দিক দৃষ্টি করে,
মাস্টারকে ভাতা দিতে পারে।।
গরীব যত মাস্টারগণ, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ,
চালাতে সর্বদা ব্যাকুল চিত্ত।
ম্যাট্রিক যিনি করে পাশ, ভাতের জ্বালা হা হুতাশ,
সমাজের এই ত চরিত্র।।

১০।৪।৬৪, চট্টগ্রাম।

[২৭ গান তাল খেমটা]

মনের মিলন না হলে ভাই মুখে মিলন হয় কি বল,
শোষক ধনীর হাতে পরে, আমাদের সর্বনাশ হল।
মিলনে শান্তি পাবে, বিবাদে উচ্ছন্ন যাবে,
বিচার করে দেখুন এবে, এই দুটুতে কোনটি ভাল।
লুটতরাজ হত্যা অত্যাচার, এই একটা জঘন্য ব্যাপার,
কায়েমি কার এই সংসার, সেই কথাটা বুঝে চল।
দাংগা হাংগামা করে, পথে ঘাটে মানুষ মরে,
দেশের সুনাম নষ্ট করে, কি লাভ হল বল বল।
দেশের পাগলের পাগলা কথা, মিলন ছাড়া শান্তি কোথা,
পাষাণে ভাংগিলে মাথা শান্তি কি তায় লাভ হইল।।

১০।৫।৬৪, গোমদণ্ডী।

[২৮ চৌষট্টি সনের নির্বাচন]

ভোট হবে ভোট হবে বলে দেশে পইল সারা
মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ ইলেকশানে খাড়া।
বিরোধী দলীয় গণের মনোনয়ন পেয়ে
মাদারে মিল্লাত দাড়াল গণশক্তি নিয়ে।
গণতন্ত্র কায়েম হবে বলে জোর গলায়
খোদা মালুম নির্বাচনে ফল কি দাড়ায়।
কেহ বলে মেয়ে মানুষ কত শক্তি ধরে
রাষ্ট্র পরিচালনায় পুরুষ কয়জন পারে।
কেহ বলে বিবি আয়েসা রোকেয়া ইত্যাদি
চাঁদ সুলতানা ঝাঁসির রাণী এলিজাবেদ আদি।
অনেক মেয়ে রাজ্য শাসে রয়েছে প্রমাণ
নানাভাবে নানা মতে দিতেছে বিধান।
কায়দে আযম কষ্ট করে পাকিস্তান আনে
পাক জায়গা পবিত্র স্থানে অশুভ ভাব কেনে।
নাথুরামে গুলি করি গান্ধির জীবন শেষ
আকবর হায়দার আততায়ী দয়ার নাই লেশ।
উজিরে আযমে ধ্বংস আকবর হায়দার করে
খান সাহেব ছুরিকাহত খুজি পায়না তারে।
প্রফেসার নোভাক দাংগায় মারা যায়
হিন্দু কি খৃষ্টান কেহ ভাবি নাহি চায়।
একের দোষে অপর মরে স্বাধীন পাকিস্তানে
সভ্য দেশ বলে লোকে বলিবে কেমনে।
সাম্প্রদায়িক দাংগা হয় যাহার কৌশলে
তারা আজ গণ্যমান্য সর্বলোকে বলে।
নিরীহ লোক মারা যায় শিশু নারীগণ
কে জোগায় ভেবে চায়না এই দাংগার ইন্ধন।
গরীবে গরীবে যদি এই দুঃখ বুঝিত
রামের দোষে শ্যামের দণ্ড কদাপি না হত।
বাস্তত্যাগি হিন্দু মুসলিম এই দুঃখ নিয়া
দাংগার আগুণ জ্বলে ঘুষিয়া ঘুষিয়া।
যইবার হয়ে গেছে এই শপথ নাও
সকলে মিলে সাম্প্রদায়িক বন্ধ করে দাও॥

৮।১০।৬৪, গোমদণ্ডী।

[২৯ অভিনন্দন]

ভাসানী যখন ইউরোপে, বহিখান বাজারে দেখি,
অভিনন্দন দিতে এলেম পুলক চিত্তে, হইয়ে অত্যন্ত খুশি।
সাদরের গ্রীস্মে দিলে সকলের, ভাল বাসিতে হবে,
অমৃত বৃক্ষে বিষ ফলিবে কে জানে এমন হবে।
ইউরোপে জন্ম ধরিয়া, এশিয়ায় প্রকাশ হলে,
সাতটি বৎসর ভুলের সাগরে, ডুব দিয়ে কাটিয়ে দিলে।

প্রকৃতি রাজ্যে সবাই গতিশীল, স্থবির কৈ কি রবে,
সত্যের অপলাপ ঘটিবে যেইদিন, ইতিহাস মিথ্যা হবে।
ভুলে নাই ভুলিবে না কভু জনতায় তোমার বাণী,
সেখানেতে তপন তুমিও তেমন প্রকাশ হয়েছ শুনি।
কে করিবে তব কণ্ঠ রোধ, পারিবে কি কোন কালে,
পাংশু আচ্ছাদিত পাবক যেমন, বায়ুর পরশে জ্বলে।
অসংখ্য কলেবর পরিগ্রহ করে, এই স্বাধীন পাকিস্তানে,
প্রতি ঘরে ঘরে তোমার স্থান হউক, এই কাম্য সদাই মনে ॥
৪।৬।৬৫, গোমদণ্ডী।

[৩০ ভোটের গান]

হুননি ও গন্যার বাপ ভোট দিবার কই পাঠাছে,
ভোট হবে ভোট দিতে যাইও এই কথা কই ঢোল পিটাছে।
আমার ভোটে মেম্বার হইয়া আমার রক্ত চুষি খায়,
হক ইনছাপে কও তা দাদা তারে নি ভোট দেওয়া যায়।
ভোট দিয়াছি বারে বারে
আমার কি উপকার করে,
আর একবার ভোট দিতাম তারে মোরে নি পাগলে পাইছে॥

ভোটের সময় হলেরে ভাই গরীবের গায় হাত বুলায়,
তারপর গরীব বাঁচে মরে মিঞায় নি আর ফিরি চায়।
গাড়ী করি যেতে ভাই
সালাম-আলকি দিয়া চাই,
মিঞার মুখে হাসিত নাই বোধ করি কি অসুখ আছে॥

আইন সভায় মেম্বার হল শুন একটা খোঁজ খবর,
তিন বৎসর পর উঠ্যা গেছে পাক্কা এক তেতালা ঘর।
দরোয়াপ করত ভাই
এত টাকা কোথায় পায়,
পর্দ্দা টেবিল বিজলি বাত্তি রেডিও মটর এনেছে॥

ভাবি চাও দেশের ভিতর গরীবের হিত করে কে,
সব মিলে চল এবার ভোট দিব তাহাকে।
দেশপ্রেমিক যদি হয়
জেল ফাঁসির নাহি ভয়,
তারা যদি মেম্বার হয় গরীব গুন্যার পরাণ বাঁচে॥

[৩১]

ইণ্ডিয়া একি কাণ্ড লাগাইয়ে,
মাউণ্ট বেটনের রোয়েদাদ কিল্যাই উল্ডাইয়ে॥
মোদের পাশাপাশি দেশ,
মিলি মিশি সহ-অবস্থান করে দিয়ে শেষ,
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কি বুঝিয়া যোটাইয়ে॥

মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চল হবে পাকিস্তান,
সেই হিসাবে কাশ্মীর মোদের রয়েছে প্রমাণ।
নেহেরুর জীবন অবসান শাস্ত্রীতো নীরব রইয়ে।।
যেদিন জিন্নাজি ওফাত,
জোর করে করিল দখল মোদের হায়দরাবাদ।
তবু তাদের মিটেনি স্বাদ, বহুবার হানা দিইয়ে।।
নুন নেহেরু যেই চুক্তি ছিল,
বেরুবারি দিবার কথা একদম ভুলিয়া গেল।
গ্রাহাম ডিকসন কত এল, তারাও কি রায় দিইয়ে।।
কেনেডি কি বুঝ বুঝিল,
ইণ্ডিয়ারে রস-সম্ভার বহুত যোগাইল।
কাজের মত ফল ফলিল উপরওয়ালা চাই রইয়ে।।
দুনিয়ায় ভাই মিলে মিশে থাকন বিনে আরত শান্তি নাই,
সহ-অবস্থান মধুর শব্দ ভাল মাইন্ষে কই গেইয়ে।।

[৩২]

জোর কদমে এগিয়ে যাও ভাইরে বীর যোয়ান,
দুয়ারে এসেছে দুষমন নিকাল তার জান,
ভাইরে নিকাল তার জান।
তৌহিদের তলোয়ার, চমকে বিজলি ধার,
আওয়াজ ঝলত ঝলতকার শত্রু কম্পমান। (ঐ)
হিন্দুস্থানি সৈন্য ভারি, তাতে কি আতংক করি,
মোদের একজনে হাজারজন মারি, নাই তার নাম নিশান।
ইসলামের পূর্বাপর নীতি, জেহাদে আসেনা ভীতি,
বড় বড় জংগ জিতি, উড়ায় জয় নিশান। (ঐ)
কামান বন্দুকের গুলি, অন্য দিকে যাবে চলি,
আল্লাহু আকবর বলি, ঠিক রাখ ঈমান।। (ঐ)
এইটা মানবতার যুদ্ধ, গণতন্ত্রের হয়ে বাধ্য,
করতে হবে যথাসাধ্য খোদা মেহেরবান।।
আসমান বদলে ফেরাউনে-নমরুদের লড়াই
মনে ভারথেকে যেত, হিন্দুস্থানে শাস্ত্রী বেইমান।। (ঐ)
আঠার বছর গত হতে ডিকসন গ্রাহাম হল গেল,
রাষ্ট্রসংঘ কি করিল, কর অনুমান।। (ঐ)
কন্সার্টিয়াম বৈঠক দিতে, গরিমসি কেন তাতে,
বাহির হতে শংখ হাতে, আসুক পাকিস্তান।।

[৩৩]

ভাইসব নয় বছুর গত হইয়ে,
বড়মিয়া মজা উড়াই আরামছে রইয়ে।
বিনা রক্তপাতে বিপ্লব করি দেশত শুনাম জোগাইয়ে।।
ভাইসব বেলুচির খবর, ঈদর জমাতে বোমা ঢালিল মছল্লির ওপর,
সতর জন মানুষ মরি গেল, সাত জনরে ফাঁসি দিইয়ে।।

ভাই হুশে নকুলার বিনা রক্তপাতে বিপ্লব কি করি বুঝাব
ইচ্ছামত কারবার চালার ডিক্‌টেটারশীপ পাইয়ে ।।
টেক্কর পূর্বপুরুষ ঊনত্রিশ জন ভাই,
টেক্কর পূত টেক্কর নাতি দেশত জাগা নাই।
জন্মনিয়ন্ত্রণ মাইন্‌ষের লাই, টেক্কারলাই কড়ে গেইয়ে।
মোরা সব সময় দোষী,
জোয়ালের তলে কল্লা দিলে দাদা বড় খুশী।
যদি নড়ি চড়ি গলার ফাঁসি, ফাশিবার বুদ্ধি লইয়ে ।।
শুন যত দেশের ভাই,
ভিজা কাঁথা পিডত বান্ধি থাকার সময় নাই।
আন্দোলনে পড় ঝাপাই জানর লাই আর কী রইয়ে ।।

[৩৪ গান]

মাতৃজাতি সব আর কেন নীরব উঠ-উঠ সবে জাগিয়া,
উদ্বোধন মঞ্চে ভৈরবি যন্ত্রে আকাশ বাতাসে ধ্বনিয়া।
জগতের হিতার্থে পুজিত রমণী, পুরুষ প্রধান সমাজ তাই এত গ্লাণি।
নারী নির্যাতন দিবস যামিনী, চলে যুগ যুগান্তর ধরিয়া।
আন্তর্জাতিক যত মেয়ে যায়, পুরুষের সনে সম মর্যাদায়,
জাতির সংকটে রাইফেল চালায় নারী বাহিনী সাজিয়া।
ষাইট হাজার গ্রাম পূর্ব বাংলায়, প্রতি গ্রামে যদি এক মেয়ে দাড়ায়,
নারীদের প্রভাবে অসাধ্য সাধিবে, বদ্ধ দুয়ার যাবে খুলিয়া ।।

[৩৫ নারী নির্যাতন কবিতা]

আমাদের সমাজের নারী, রেখেছি বন্দিনী করি,
দাসিপনা বিনে নাহি জানে।
চীন জাপান রাশিয়ায়, মেয়েরা বিমান চালায়,
দেখে শুনে চেতনা নাই কেনে।
মেয়েরা কি করবে আর, পুরুষগুলি যে গোঁয়ার,
বের হলে বলে নষ্টা ভ্রষ্টা।
নারী জাগরণ বিনে, মুক্তি নাই কোন দিনে,
কেহ নয় ভবিষ্যত দ্রষ্টা।
সাধারণ ঘরের মেয়ে, আছে যত দুঃখ সয়ে,
সেদিক কেহ ফিরে নাহি চায়।
দিবা নিশি নির্যাতন, তবু সহাস্য বদন,
একমুট ভাত আর কাপড়ের আশায়।
শ্বশুর আর শাশুড়ী, স্বামী ভাসুর অধিকারী,
কথায় কথায় গঞ্জনা দেয় কত।
শ্রম করে সারা বেলা, তার পুরস্কার অবহেলা,
ভোগ্য বস্তু পণ্য দ্রব্যের মত।
উঠান ঝাড়ু গোয়াল ঘর, দিতে হয় অষ্টপ্রহর,
ধান শুকান ধান ভানা গোলায় তোলা।

ঘাস বিছালি গরুর তরে, মাথায় করে আনে ঘরে,
তবু আদর পায়না দুই এক তোলা।
ভিজা লাকরি চুলার ধারে, ধোয়ায় চোখ অন্ধ করে,
গ্রীষ্মেতে গরমে রন্ধন।
বাসন মাজে বাটনা বাটে, উৎসাহে আপ্রাণ খাটে,
স্বাদ হয় কিনা কেমন।
তবু সকাল বিকাল গালাগালি, মা মাসি বাপকে ভুলি
নির্বিকারে সহ্য করে চলে।
মার খায় মাঝে মাঝে, চোখের জলে বক্ষ ভিজে,
কি সাধ্য মুখ তুলে কথা বলে।
অত্যাচারে অবিচারে, প্রতিবাদ জানাতে নারে,
এইতো সমাজের পরিণতি।
ঘর সংসার রাখিতে ঠিক, নজর থাকে চারিদিক,
অসুখে শুশ্রুসায় থাকে ব্রতি।
শীতে দারুণ কষ্ট হয়, আঁচল জড়ায়ে রয়,
দেহ কাঁপে ঠক ঠক করে।
পুরুষের পায় জুতা গায় শাল, এই ভাবে যায় চিরকাল,
কি দোষ করেছে বলো নারী ॥

[৩৬ বিধবা বিয়া কবিতা]

সমাজে বাস করে যারা মোড়ল মাতব্বর।
কেমনে সমাজ চলে রাখেনা খবর ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর গত ২ বলব কত হল পরস্পর।
সতীদাহ প্রথা ছিল ভারত ভিতর ॥
প্রথমে ছেলে হলেই ২ গংগাজলে করত বিসর্জন।
এইভাবে ধর্মে রত ছিল হিন্দুগণ ॥
লর্ড বেংটি-এর কালে ২ ডেকে বলে যত হিন্দুগণে।
জল আগুণে মানুষ মারি ধর্ম হয় কেমনে ॥
একি অবিচার ২ অত্যাচার কভু না করিও।
আইন মতে শাস্তি পাবে মনেতে রাখিও ॥
তখন হিন্দুগণে ২ ভাবি মনে করিল বিচার।
ডাইল অম্বল ঝোল ঘন্ট বিধবার আহার ॥
পরণে সাদা ধুতি ২ কিবা ক্ষতি করে বার মাস।
দিবসে একবেলা খাবে রাত্রে উপবাস ॥
এখন কলিকাল ২ বেসামাল নাহি ধর্ম ভয়।
ভ্রূণ হত্যা ব্যাভিচার যেই সেইখানে হয় ॥
এই সব মহাপাপে ২ ধরা কাঁপে ভূমিকম্পের বেগ।
রোগ শোক জাত্যান্তর নানান উদ্বেগ ॥
নিয়ে কাল ধর্ম ২ বুঝ মর্ম কর্ম কর সার।
সহসা প্রচার কর বিধবা বিয়ার ॥
নতুবা বিপদ ভারি ২ চক্ষে হেরি সমাজ নেতাগণ।
হিংসা নিন্দা অভিমান কর বিসর্জন ॥

মহাত্মা গান্ধির মতে ২ সবকাজেতে একতাটি চাই।
বিধবা বিয়ে বিনে আর মঙ্গল নাই ॥
নতুবা দিন দিন ২ হবে ক্ষীণ আমাদের সমাজ।
প্রতি পদক্ষেপে মোরা নিত্য পাব লাজ ॥
দেখ নারী মইলে ২ পুরুষ দলে দুই তিন বিয়া করে।
পুরুষ মলে নারীকুলে স্বামী লইতে নারে ॥
সেইটি বিচার নয় ২ জুলুম হয় রমণীর উপর।
তিন চিনার লেবু তিক্ত জানে চরাচর ॥
নারীর সুদিন এল ২ প্রভু দিল যুগ ধর্মের ফলে।
মাথা তুলি ঘোমটা খুলি হাটবাজারে চলে ॥
এই সব কি পূর্বে ছিল ২ বল বল এখন দেখতে পাই।
জুতা পায় পায় থালায় খাওয়া ঘটি ধোয়া নাই ॥
পৈতা শূন্য হোটেলে খানা ২ শাস্ত্রমানা কয়জন হিন্দুমানে।
বেল পাতা আর তুলসি পাতা তুচ্ছ যত দিনে ॥
চা পাতার আদর বেশী ২ কসাইর খাসির মাংসতে সন্তোষ।
সকল কার্য চলে কেবল রাঢ়ী বিয়ায় দোষ ॥
উষন্না শাস্ত্রে বলে ২ পতি মইল বংশের কারণ।
নিয়োগ করিতে আদেশ দিলেন মুন্সীগণ ॥
সবর্ণে তাস বর্ণে ২ শাস্ত্রে বর্ণে নিষিদ্ধ নয়।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু বিদুর নিয়োগে হয় ॥
ব্যাসের কি কম বুৎপত্তি ২ লিখে পুথি চন্দ্রবংশ সকল।
বিধবার গর্ভে উৎপত্তি কুরু পাণ্ডুকুল ॥
করে বিধিমতে ২ নষ্টে মৃতে বর্জিতে পাতিত।
এই পঞ্চ পতিরণ্য সাস্ত্রেতে বিদিত ॥
যৌবনে কামের জ্বালা ২ প্রাণ উথলা স্ত্রী পুরুষের করে।
ইন্দ্রিয় সংযম করি কয়জন থাকতে পারে ॥
হলে অপগর্ভ ২ জাতে খর্ব লোকে জানাজানি।
পুলিশে তালাসে বাড়ী হলে হাসিল খুলি ॥
তোলে প্রকাশ করি ২ বৌ ঝিয়ারি সবাইর মান তো যায়।
ইষ্ট বন্ধুর মুখটি মলিন ছেলে গরু খায় ॥
কলংক জগৎ জোড়া ২ জন্মভরা দেখিলে রাস্তায়।
কেহ বলে এইত মোদের পণ্ডিত মশায় যায় ॥
কেহ কয় ঘাটের নৌকা ২ পারে ঠেকা আছে কি বিষয়।
এই সব লাজে বুঝে সুঝে যাটি ঝলটা লয় ॥
কপালে তুলসি মাটি ২ তিলক কাটি বৈরাগিনী বেশ।
কোনটি হয় বারাংগনা লোক লজ্জার ক্লেশ ॥
করুন বিবেচনা ২ এই গঞ্জনা নিবৃত্তি কারণ
বিধবা বিবাহ ত্বরা করুন প্রচলন ॥
শীঘ্র প্রয়োজন পুত্র ২ বিয়ার শুত্র তাই আয়োজন।
পুত্রার্থে কিয়তে ভার্যা সাস্ত্রে নিরুপণ ॥
বৃদ্ধ লোকের নারী মইলে ২ বিয়ের ছলে চুলেতে কলপ।
দুই দিন পর সে তারে করে লয় তলপ ॥
ঘরভরা পুত্রনাতি ২ বৃদ্ধ পতি হয় বালিকার।
সমাজনেতা পণ্ডিতগণে করে নাই বিচার ॥

মনে কয় নিয়তির কর্ম ২ তার মর্ম একটু জানতে চাই।
বিধবার বিয়া লিখতে ব্রহ্মার দোয়াত কলম নাই ।।
আজ মন দুঃখে ২ যাই লিখে বিধবার বিয়া ।
এই ভাবে চলিলে সমাজ হবে নিঃবংশিয়া ।।

গ ।। **বিবিধ** :

এখানে পত্রস্থ বিবিধ বিষয়ক ৩৮-৪১ সংখ্যক রচনা স্মৃতিকথামূলক। অন্যান্য রচনা ব্যঙ্গাত্মক ।

[৩৭ আভিজাত্য ছড়া]

ভাতের সঙ্গে জাতের খেলা পূর্বাপর চলে,
ভাবিয়া দেখেনা কেহ কি রহস্য মূলে ।
ভাত খেলে জাত যায় পূর্ব হতে শুনি,
আভিজাত্য বজায় রাখতে এই সকল কাহিনী ।
যার ভাত তার জাত যদি আমরা পাই,
অন্তজের ভাত খাইলে যদি অন্তজ হয়ে যাই ।
এই নিয়া বাক বিতণ্ডা শুনি সব সময়,
ব্রাহ্মণের ভাত খেলে কেন ব্রাহ্মণ নাহি কয় ।
জেলেরা মাছ ধরে করে জীবিকা পোষণ,
পেশকারি নাজিরি সব জীবিকা কারণ ।
কাপড় ধুয়ে ধোপা বলে জাতি যদি হয়,
পেশকার জাতি নাজির জাতি হয় না কি বিষয় ।
দরিদ্র নীরিহ যত সমাজে আছে,
ব্যবসা নাম দিয়ে জাতি তার মাথায় চাপায়েছে।
মুসলিম আনিলে পানি হিন্দু নাহি খায়,
বোতলে পুরালে জল তবে খাওয়া যায় ।
নাম হবে লেমনেড কি সোডা ওয়াটার,
স্থির চিত্তে কেহ তাহার করে না বিচার ।
ঘরের দরজায় রাখে পা ধোয়ার পানি,
খৈয়রে বানালে কালি পায় বলি দানি ।
প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধি করে জাত গেলে জাত পায়,
অন্তজের ভাত খেলে জাতটি কয় মাইল দূরে যায় ।
কোথা হতে এল জাত শুদ্ধি হওয়ার পর,
কোনখানে জাত প্রবাস করে জান কি খবর ।
আপন আভিজাত্যটুকু রাখিতে বজায়,
উচচ নীচ সৃষ্ট করা মূল অভিপ্রায় ।
বেহারাগণ সিবিকা করিয়া পাত্রী আনে,
তাদের কুষ্টি লিখা নাকি ভাবি মনে মনে ।
পিতা পিতামহ তুল্য বড়সেতে খুড়া,
কোন সভ্যতায় বিধান একটি তাদের কান্ধে চড়া ।

অন্ধ রোগা পঙ্গু হলে তবু শোভা পায়,
হাত পা আছে চক্ষু আছে কেন পাল্কি চড়ি যায়।
মানুষের অন্ধ চক্ষু খোলে জানি কবে,
এইসব জংলা কেটে গেলে বাংলা আবাদ হবে।
৬।১১।৩৩, গোমদণ্ডী।

[৩৮ চট্টল প্রশস্তি]

সুজলা সুফলা দেশ শান্তি সুখের একশেষ বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম।
চট্টলে আছে যত সাধু সিদ্ধা অগণিত একমুখে কত নেব নাম।
মা চট্টল জননী শান্ত ছায়িনি তোমায় সকলে ভাবে।
এয়ো নছিপাল তোমার ছাওয়াল তোমার কোলে শোভে।
পরাগল খাঁ আর ছুটি খাঁ কৃতি সন্তান তব কবি।
আলাওল আর দৌলত কাজি গিয়াছে তোমায় ভাবি।
কবি নবীন সেনে এক বাক্যে চিনে এই বাংলার জনগণ।
পলাশির যুদ্ধ পরলোক মুগ্ধ দেশপ্রেম হয় উদ্দীপন।
শশাংক সেনে শশাংকের সনে তুলনা করি লেখিলে।
আরও নবীন দাশ কবিত্ব প্রকাশ করেছে প্রতিভা বলে।
আশুতোষ চৌধুরী বহু যত্ন করি লুপ্ত গ্রন্থ যত ছিল।
সংগ্রহ করিয়া ভাষায় রচিয়া প্রচার করিয়া দিল।
লিখে ধ্যানলোক চট্টল আলোক জীবেন্দ্র দত্তের দান।
কবিত্ব উৎসুকে বিপিন নন্দী লিখে সপ্তকাণ্ড বাদস্থান।
শ্রীকর নন্দী পূর্ব পুরুষ বিপিন নন্দীর ছিল।
কল্পনা কাননে কবিতা কুসুমে চয়ন করিয়া গেল।
সাহিত্যদরদ সাহিত্যবিশারদ অবদুল করিমে রাখে।
বৃদ্ধ বয়সে সাহিত্য রসে নিত্য সিক্ত হয়ে থাকে।
পল্লী কবি যত ছিল শত শত নবীন চক্রবর্তী সেরা।
অতি শুভক্ষণে কধুরখিল গ্রামে উঠেছিল শুকতারা।
আকবর আলী গোমদণ্ডী গ্রামে পুঁথি সাহিত্যিক ছিল।
মকবুল আহমদ বহু কবিতা রচনা করিয়া গেল।
আলি মিঞা গোমদণ্ডিতে যেমন কবিতার খনি।
প্রত্যেক কথায় কবিতার ছন্দ স্বভাব কবি বলে জানি।
মুক্তি বীরগণ ছিল অনেকজন সেরা যতীন্দ্র ব্যরিষ্টার।
ইসলামাবাদি কাজেমালি মাষ্টার কত বলি আর।
সূর্যসেন সূর্য সমতেজে তেজোয়ন বেশ আজি।
অনন্ত লোক বলে তারক নির্মল কালী দে অদ্যবধি।
আর বহু আছে কত লব নাম বই ভার হল ভয়।
ঢোল বাদ্যে ঔমারন দাশ অর্পনা বাদ্য কর কয়।
পটি কীর্ত্তনে লক্ষ্মচরণ গাইন খ্যাতি বহুতর।
নৌকা বাইয়ে পাইরল গানে সেরা ছিল সতাম সুন্দর।
গাজি গায়কে আজগর আলি চান মিঞা ওয়াদ আলি।
ফুলপাট গানে কালী সরকার প্রধান বলে বলি।
জারি গানে মহবত আলি কালু কর্মকার দলদড়ি নিবাস তার।
হুলিতে ছিল গগণ জলদাস প্রশংসা আছে তার।

ভিষক প্রধান নীলকমল আর জয়ন্ত দাসগুপ্ত জানি।
গুরুদাশ পণ্ডিত ভেষর্জ্যে পণ্ডিত নাম বিজ্ঞানী।
শেখ ফরিদ সুলতান বায়েজিদ চট্টগ্রাম আস্তানা পাতে।
শাহা আমানত পীর বদর সিদ্ধ চার তরিকাতে।
মাইজভাণ্ডার দরবার শান্তির আধার ফকিরি সাধনা করলে বলে।
... ...
হাইদগাওতে বড় পীরের দরগায় ফকিরকাজি কম জানি।
আল্লাগ্রামে কজি সাহা ছিল সকলে এক বাক্যে মানি।
শাহ অছিয়র রহমান ছিল চরণদ্বীপেতে বাস।
সাহা হারবাংগিরি সিদ্ধ পুরুষ আর কিছু পূর্ব পাশ।
শুয়াবিল গ্রামে গুরুদাশ ফকির সর্বলোক জানা।
গোমদণ্ডী গ্রামে হরিকৃপান্দ সিদ্ধপুরুষ ঘোষণা।
ষোল শহরে জগদান্দ পরমহংস জ্ঞানবান।
জগদান্দ মিশন নাম এখন কধুরখিল সমাধিস্থান।
গৌবিন্দ মহারাজ গোমদণ্ডী মাটি পবিত্র করে।
অন্নদা বিশ্বাস বাঙালীর বাস গোমদণ্ডীতে জন্ম ধরে।
মেখল গ্রামেতে মহাপ্রভুর পার্শদ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি।
গৌরাঙ্গ দেবের ছিল কাছের মতেন নিরবধি।
সূর্যসেন অনন্ত টেগরা নরেশ কালী।
লোক নির্মল প্রভাস স্বদেশ রায় বীরবলে যারে বলি।
প্রিয়দা মোক্ষদা অর্ধেন্দু মধু বিনোদ দত্ত আদি যারা।
অমূল্য আচার্য কালীদে ইত্যাদি শ্বেতাংগ করেছে সারা।
বিনা দাস কল্পনা দত্ত আরও প্রীতিলতা ওয়াদ্দার।
বীরকন্যা চট্টলে সর্বলোকে বলে কৃতিত্ব ওই চট্টলার।
৮।৩।৪৪, গোমদণ্ডী।

[৩৯ পিছে ফেলা দিন]

আমার পূর্ব স্মৃতি জাগে মনে, আমার প্রথম জীবনে,
আনন্দময় ছিল চট্টগ্রাম।
ভরাপুরা ধনধান্য, বহু ছিল স্বনামধন্য,
একমুখে কত লব নাম।
হিন্দু আর মুসলমানে, মিলন ছিল প্রাণে প্রাণে
পরস্পর সুখে দুখে সাথী।
উৎসবে কি পাল পার্বনে, নানারকম বাদ্যগানে,
আনন্দে কাটাতাম দিবারাতি।
সেইদিন কোথায় গেল, দেশের কি দশা হল,
সেই আনন্দ গেল আজ কোথায়।
ছেড়ে দিয়ে মানবতা, কেহ কয়না দেশের কথা,
ক্রমে দেশ অধোমুখী যায়।
যেই রমণী সম্মান রাখিতে, মাথায় ধরে শম্ভু নাথে,
সাগর বান্ধিল রঘুনাথ।
নন্দলাল যার ধরে পায়, সেই মাতৃজাতির গায়,
মিলেটারি গুণ্ডায় দিচেছ হাত।

মনে মনে ভাবি তাই, মানুষ আর মানুষ নাই,
নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে।
লোভ লালসা সর্বদাই, দেশের প্রতি দৃষ্টি নাই,
নোটের ফেরে বাঙালী পরেছে।
নোটকাগজ টাকা কড়ি, পাকাবাড়ী জমিদারি,
সত্তর আশি বৎসরে বেশী নয়।
দশের দেশের হিত করে, সেই মানুষ মরণ পরে,
কীর্তিনিয়া অমর হয়ে রয়।
চন্দ্রসূর্য যতদিন, সেনগুপ্ত নাম ততদিন,
ঘোষিবে যশ এ সোনার বাংলায়।
তাই বলি বন্ধুগণ, করুন সবে প্রাণপণ,
দেশ যাতে প্রগতিমুখী ধায়।
শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পে, সকলের উন্নতি কল্পে,
আত্মপর না করি বিচার।
এক থাকি ভাই ভাই, হোক না আর ঠাই ঠাই,
জাতি ধর্ম থাক যেই যাহার।
একে আমি বয়ঃবৃদ্ধ, দেশের জন্য হয়ে বাধ্য,
দুঃখের সহিত করি আবেদন।
স্বদেশের ভাই বোনদের কাছে, বলবার আমার দাবী আছে,
পল্লী কবির এই নিবেদন ।।
৭।১১।৪৬, গোমদণ্ডী।

[৪০ ধর্ম সভায় ভাষণ]

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত সদ্‌জনমণ্ডলী, প্রিয় ছাত্র মা-বোনগণ।
বড় আশা নিয়ে প্রাণে এসেছি সভার স্থানে করিতে অভিনন্দন।
আজ এই পুণ্য দিনে সুধীভক্ত সর্বজনে এই সভায় হয়েছেন মিলিত।
আবাল বৃদ্ধ বনিতায় গুরু জ্ঞানে এই সভায় সবার কাছে মাথা করি নত।
যা দেখি ব্রহ্মাণ্ডময় গুরু বিনে কেহ নয়, গুরু ব্রহ্মা প্রভুর মূলের কথা।
গুরু বিশ্বাস হল যার তার চরণে নমস্কার মানুষরূপে সেইত দেবতা।
অস্বীকার করিবার যোগার নাই।
গৃহস্থ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী পরস্পর মন কষাকষি দেখে মনে বড় দুঃখ পাই।
মানুষ বাল্যকালে যাহা শুনে বিকাশ করে যৌবনে সেই সংস্কার আজীবন রয়।
মূল সত্য চাপা পরে উপলব্ধি করতে নারে স্বরূপ উদয় নাহি হয়।
দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ সাকার কি শূন্যবাদ নিজের সংস্কার সত্য বস্তু জানে যেই।
অন্যের সংস্কার ভুল বুঝতে নারে সত্যের মূল হিংসা দ্বেষে ভাসে সেই।

[৪১ লোকসংস্কৃতি]

লোক সংস্কৃতি চাঁটগায় অস্তমিত হল প্রায়,
চারণ ভাটে পল্লীগ্রামে আর কবিতা না শুনায়।
বাউলের একতারাও শুনিনা টংকার চলে গেছে বহুদূর,
লক্ষ্মী চরিত্র বহুরূপী সাজে গ্রাম ছিল ভরপুর।

নৌকায় পাল তুলে মাঝি মাল্লারা শারি গাইত সুখে,
হেইও হো হেইও হো বদর বদর হালদা কর্ণফুলির বুকে।
কৃষক গাহিত হাল বাহিতে নানান ছন্দেতে গান,
মাটির মানুষে মাটির সুরেতে মোহিত করিত প্রাণ।
ঘিরিয়া বসিত বুড়ী ঠাকুমারে খোকাখুকী মিলি,
আহার নিদ্রা তুচ্ছ হত তাদের শুনিতে ঐ ছড়াগুলি।
ডুবিয়া যেতেছে লোকসাহিত্য সূর্য পটের মত,
মাটির সংগে মাটির সুরগুলি সকল হতেছে গত।
আজীবন যার লোকসাহিত্যে অতিশয় দরদ ছিল,
আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরলোকে চলে গেল।
ছিলাম যার বলে বলি সেই গেল চলি আমারও ঘাটে তরী,
অমূল্য সম্পদ লোকসাহিত্য কেমনে উদ্ধার করি।
শহর সংস্কৃতির কদর বেড়েছে গ্রাম্য সংস্কৃতি নাই,
কিন্তু সংস্কৃতির উৎস গ্রাম্যসংস্কৃতি কেহ না ফিরিয়ে চাই।
মহররমের চাঁদ উঠিত যখন জারি গানের ধূয়া শুনি,
কারবাল্লার কাহিনী শ্রবণ করে চোখে আসিত পানি।
বসন্ত উৎসবে হুলি গান চলিত প্রশ্ন-উত্তর হত বেশ,
সারা রাত্র লোক বসিয়া শুনিত রাত্র ভোর হলে শেষ।
গাজী গায়করা গিয়া পাড়াপাড়া পালা গান করিত জানি,
গাজী কালুর ফকিরি সাধনা অদ্ভুত কাহিনী শুনি।
মালকা বানুর গান রেকর্ডে বাজে শুনিতে পাই আজি,
আরও দেবল্যা বানালি মোরে সম্পানের মাঝি।
দুই শত বৎসরের এই সকল সুর লোকের মুখে মুখে চলে,
চট্টগ্রামের নিজস্ব সুর এইসব জানে কি কোন কালে।
প্রতিভাবান বহু শিল্পী চাঁটগায় ছড়ায়ে আছে,
সহানুভূতি হীন অপাংক্তেয় হয়ে দিন কাটিতেছে।
আধুনিক শিল্পীরা তাদের সংগে হাত মিলাবে আজি,
সীমান্ত চট্টল লোক সংস্কৃতির উঠিবে ঢংকা বাজি।

[৪২ গান]

বুড়িরে কেহ না পারে বুঝ দিত।
কান্দি কান্দি খুন হর বুড়ি হিন্দুস্তান যাইত।
বুইর্গার আশা একলা যাইব বুড়িরে হংগে ন নিত।।
বুড়ির মনর ভিতর খোঁজ,
দুঃখে কষ্টে পার হৈ গেলে কনে ধরের দোষ,
বেহান বিকাল করে আপসোশ আটার রুটি ডাইল খায়।
যারা হিন্দুস্থান যাইব, দণ্ডকারণ্য রাম বনবাস হেই জাগাত নিব,
যম দুয়ারত হাজির হৈইব, বাঘ ভাল্লুকে ভিল্‌কাই।
হেডের খব্বর জাননি, বার জঙ্গল আবাদ করের রিপুজি আনি।
বুজ্যা বুড়ির বল আছে নি গাছর ঝুঁয়া উল্ডাইত।
বহুত হিন্দুস্থানত যাই, ধাই চলি আইল পাকিস্তানত ভাত পানি ন পাই।।
বুজ্যা বুড়ি দোনজন যাই হিতারে জিজ্ঞালে গৈ বুঝ পাইত।
মামা ভাইগ্না ঝি, জামাই হুক্কুলুন রইল। [অসমাপ্ত]

[৪৩ ধর্মের শোষণ]

সমাজের পুরোহিতগণ, বৈদিকের পূজা পার্বণ,
সম্পাদনে ব্যস্ত সর্বদাই।
একটুখানি দিষ্টি দিলে, ওসব কাজে শোষণ চলে,
স্বার্থ সিদ্ধি উদ্দেশ্য সদাই।
পূজা পার্বণ দেবার্চন, অথবা শ্রাদ্ধ তর্পণ,
হিন্দু ঘরে বার মাস চলে।
প্রত্যেক পুরোহিত দলে, কাজ চালায় এই কৌশলে,
দোয়া ফাতেয়া শ্রাদ্ধ বলে।
চাউল আর তরকারী, উৎসর্গ হয় হিন্দু বাড়ী,
মুসলিম বাড়ী সিদ্ধ সমুদয়।
ভাত তরকারী পাক করে, বাড়ী নিবে কেমন করে,
এ রহস্য বুঝা কঠিন নয়।
বাড়ী বাড়ী শ্রাদ্ধ করায়, ভোজে খেশারি পায়,
বাড়ী নিয়া রাখে ভাণ্ড ভরি।
তিন-চার সের জমা হয়, তিনির বাবার শ্রাদ্ধ সময়,
নিমন্ত্রণ করতে যায় জজমান বাড়ী।
অনেকদিনের ডাইলগুলি, ঠিক যেন লোহার গুলি,
চুলার উপর দিয়াছে চড়াই।
সারাদিনেও হয় না সিদ্ধ, সিদ্ধ করে কার বাবার সাধ্য,
স্বয়ং অন্নপূর্ণা এলেও সাধ্য নাই।
পাঁচ রকম তরকারী, ঘন্ট একখানা পাক করি,
বলে জজমান প্রসাদ নিয়া যান।
খানা এই হল খাওয়া, তারপর দাক্ষিণা দেওয়া,
বিচার করুন এটা কোন বিধান।
জজমান বাড়ী ব্রাহ্মণ ভোজন, শেষ হয়ে যাবে যখন,
তারপর দাক্ষিণা পায় দেখি।
ব্রাহ্মণ বাড়ী জজমান যায়, দাক্ষিণা লয় কোন কথায়,
পুরোহিত ঠাকুর হোটেল দিয়াছে নাকি।
মুসলিমের সবেবরাতে, গোসত-রুটি ফাতেয়াতে,
মোল্লাসাহেব বাড়ী নিয়া যায়।
মেয়ে মানুষ মরে গেলে, চল্লিসায় অলংকার দিলে,
সেই অলংকার মোল্লা সাহেব পায়।
বৌদ্ধ ভিক্ষু যারা, নাই তাদের পুত্র দারা,
বিহারে জীবন কাটায় জানি।
দিলে ভোজন দাক্ষিণা, তখন তারা হাতে ছোয়না,
গামছা বেন্ধে মাজায় দিতে গুজি ॥

১৯।৮।৫৩, গোমদণ্ডী।

[৪৪ ধর্ম নামে স্বার্থ]

ধর্ম ধর্ম বলে লোকে, ধর্ম কি চোখে দেখে,
প্রকারান্তরে শোষণ করা যন্ত্র।

এখন উপবাসে রবে, পরকালে স্বর্গে যাবে,
কানে কানে দিয়া এই মন্ত্র।
অর্থ অনর্থ সার, আগে করেছে প্রচার,
ভাগ্যবিধাতা একজন আছে।
তার সঙ্গে নাই মারামারি, আমারে কাঙাল করি,
কেনইবা এই দুঃখ দিতেছে।
দয়াতে ধর্ম স্থাপন, শাস্ত্র সুসিদ্ধ বচন,
কারও দুঃখ দেখে দয়া হলে।
কানাকড়ি নাই হাতে, দুঃখীর দুঃখ মুছিতে,
অভাবে পারি কি কোন কালে।
রাজা ধনী জমিদারে, ব্রাহ্মণ সাধু সওদাগরে,
সেজেছে ধর্মের অগ্রদূত।
নির্যাতন নিপীড়ণ, প্রাণান্ত কর শোষণ,
ধর্মের কর্ম দেখতে কি অদ্ভূদ।
শিক্ষার উন্নত স্তরে, মানুষ আরোহণ করে,
ধীরে ধীরে আঁধার যাবে কাটি।
শীতলা আর সত্য পীর, মনসা মঙ্গলচণ্ডীর,
ক্রমে ক্রমে পূজা যাবে উঠি।
কলেরা হাম বসন্ত, লোকের করে প্রাণান্ত,
হিন্দুভাইগণ জালাকুমারি পূজে,
মুসলিমে পাড়া বন্, কলেরা বন্ধ কারণ,
ধর্মভীরু কি জানি কি বুঝে।
প্রতিকাজে পুরোহিতে, সুচতুর ইন্ধন যোগাতে,
দান কর দুর্গতি যাবে খণ্ডি।
শিন্নি করে কিওন খায়, কলেরা আমাশয় যায়,
ধর্মের কি দুর্ভেদ্য গণ্ডী।
ভ্যাকসিন কি টিকা নিতে, রাজী নাই কোনমতে,
এইত ধর্মের বেড়াজাল।
তারপর আনে পরলোক, সরল মনে বাড়ায় ঝোক,
কে জানে আর যাবে কতকাল।
ফুটেছে জ্ঞান চক্ষু, কেথায় যাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু,
কোথায় যাবে পাদ্রী ব্রাহ্মণ।
বাজিবে বাস্তবের ঢংকা, অবাস্তবের আশংকা,
চলে কেবল দেবতালয় শোষণ।
কালী দুর্গা কি কর গাই, মানত করে বেঁচে যায়,
পাঁঠা মহিষ গরু বলি দিত।
বড়লোক কি রাজার ছেলে, মানুষ দুইটা বলি দিলে,
বোধ করি অমর হয়ে যেত।
জীবের বদল জীব দিবে, তখন রোগী বেঁচে যাবে,
এই ধারনায় আছে সর্বদাই।
ক্রমে সব হবে শেষ, জাগিবে সকল দেশ,
লোকের চোখে ধুলা দেওয়া দায়।
বড়দোয়া কি দিলে শাপ, গোষ্ঠী শুদ্ধ হবে ছাপ,
বংশে বাত্তি জ্বলবেনা কখন।

বৃটিশ দুইশত বৎসর ধরে, হিন্দু মুসলিম শোষণ করে,
বড়দোয়া দিল না কি কারণ।
শিক্ষাতে দিয়া মন, করান সবে প্রাণপণ,
সমাজ উন্নতির দিকে যাবে।
নানারকম গোজামিলে, দেশ যায় রসাতলে,
হঠকারিতা বন্ধ করতে হবে ॥
৫।১২।৫৪, ঢাকা জেল।

[৪৫]

ভাইসব সবুর করুন সকলে,
চীন সরকার পাঠাইব খানা আর কয়দিন গেলে।
মোনায়েম খাঁ জোর গলাতে, প্রচার করে ঢাকে ঢোলে,
এই সব ভানুমতীর খেলে ॥
মামার বাড়ী পাকছে কাঁঠাল, ঠোঁটে লাগাও তেল,
দুইমাস পর পাইব খানা, বর্মার ভাই বাঁচিলে।
ভাই বিপদ অতিশয়, দুই নৌকাতে পা রেখেছে কি জানি কি হয়,
'শাম' রাখিনা সমাজ রাখি, কী ঘটে যায় শেষ কালে ॥
দশ লক্ষ টন চাউল আসিবে, দুই লক্ষ টন গম,
আসে না আসে পরের কথা প্রচারে বিষম।
কাজের বেলা নাইত বেশকম, পেট ভরেনি শুনালে।
শুন যত দেশের ভাই,
নিজে হুশিয়ারে চল কান্দিলে লাভ নাই।
যদি স্বায়ত্বশাসন পাই সর্বদুঃখ যাবে চলে ॥
১৬।১।৬৬।

[৪৬ অনাস্থায় ধর্ম ছড়া]

সত্য ত্রেতা দ্বাপর হতে ধর্মটি প্রবল,
ধর্ম কর্ম করে লোকে সাধিতে মঙ্গল।
শাক্ত সৌর গাণপত্য শিব বিষ্ণু পঞ্চে,
ইহকালে ধর্ম কর্মে স্বর্গে সুখে বঞ্চে।
আধুনিক সমাজে দেখি ধর্মের প্রাবল্য,
ধর্মকর্ম করে লোকে লভিতে কৈবল্য।
শীতলা মনসা চণ্ডী শিব দুর্গা রাম,
সূর্য গণেশ শনিগ্রহ কিবা রাধা শ্যাম।
মুসলিম বন্ধুরা ডাকে এক পরোয়ার,
দ্বিতীয় মোহাম্মদ নবী প্রেরিত খোদার।
পীর পয়গম্বর কত মানে একমনে,
হজ নমাজ কলমা রোজা মুক্তি সন্ধানে।
হিন্দু ভাইগণ কি শুনে করে গরাগরি,
গয়া কাশি শ্রীবৃন্দাবন কত ঘুরাঘুরি।
বৌদ্ধ ভিক্ষু দারা ত্যাগি কর্মযোগে মন,
অষ্টশীল নির্বাণ আশে করিছে পালন।

প্রহলাদে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল,
হস্তিপদ তলে পরে কভু না মারিল।
গলায় বাঁধিয়া শিলা ডুবাইল জলে,
শুধন্ধা পাইল রক্ষা পরে তপ্ত তৈলে।
ইব্রাহিম খলিলে যবে ঢালিল আগুনে,
আগুনে ফুলের বাগান ঈমানের গুণে।
মনছুরে শুলে দিল আনাল হক ফুকারে,
জকরিয়া পয়গম্বরে করাত দিয়া চিরে।
বুদ্ধকে করিতে ভস্ম দেবদত্ত চায়,
অটল অচল তিনি ছিলেন সর্বদায়।

[৪৭ বিধাতার বিপদ]

জন্ম মৃত্যু বিবাহ, বিধির ইচ্ছায় নির্বাহ,
সকল শাস্ত্র বলে শুনতে পাই।
কলিকালের দেখে গতি, বোকা বনেছে প্রজাপতি,
দোয়াত কলম ফেলেছে হারাই।
দেখা যায় পৃথিবীময়, মানবজাতি জন্ম লয়,
লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলেছে।
দিনের পর দিন খাদ্য সংকট, হয়ে উঠেছে প্রকট,
সৃষ্টিকর্তা ফাঁপরে পরেছে।
বিষ্ণু বলে ব্রহ্মা ভাই, এখন করি কি উপায়,
চাউলত আর দিতে নাহি পারি।
গম বজরা দিলাম যত, চলে যায় নস্যের মত,
এই সংকট কেমন করে সারি।
ব্রহ্মা বলে যুক্তি আছে, যেটা মরে যেটা বাঁচে,
চল ত্বরা যমের কাছে যায়।
তুমি আমি যম মিলে, বুদ্ধি করে দাড়ালে,
মাথা তুলে কারও সাধ্য নাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু তাড়াতাড়ি, চলে গেল যমের বাড়ি,
বলে তোমার প্রমোশন এসেছে।
তুমি একবার জোর করে, আধপেটা ব্যবস্থা করে,
দিয়া চাও কি মরে কি বাঁচে।
শুনে তখন যমে কয়, পেট ভরান আমার কাজ নয়,
রিযিক দাতা বিষ্ণুতো রয়েছে।
যমদূত ঘুরায়ে চায়, বাহুতে আর শক্তি নাই,
দেশে যখন দুর্ভিক্ষ এসেছে।
উঠল মহা হাহাকার, সংখ্যা বাড়ে অনিবার,
যমকে বলে জোরে কাজ চালাও।
যত পার তত মার, শীঘ্র দেশ খালাস কর,
চেষ্টা করে মোদের প্রাণ বাঁচাও।
শুনিয়া বিধাতার কথা, যম করে হেট মাথা,
ধংসলীলা আর কত পারি।

কমায়ে দাও উৎপাদন, তবে বাঁচিবে জীবন,
শীঘ্র শীঘ্র বার্থ-কণ্ট্রোল করি।
তখন বিষ্ণু উঠি বলে, কাজ হবে কৌশলে,
অন্নপূর্ণা স্মরণ কর এবে।
বিপদ দেখিবে গতিক, জলে আর রবেনা ঠিক,
অন্নপূর্ণা সব ঠিক করে দেবে ॥

টীকা ও উৎস-নির্দেশ

১ Hai, Muhammad Abdul. 'Folk Song and Folk Literature., "Traditional Culture in East Pakistan" (Edited by : Shahidullah, Muhammad & Hai, Muhammad Abdul.). University of Dhaka, Bangladesh. December, 1963. pp-20

২ সুকুমার সেন। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"। মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ভারত। ১ম সংস্করণ: ১৯৪০। পৃ. ১০৫২

৩ এই দম্পতির আরও তিনজন কন্যা সন্তান ছিল।

৪ অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তীকে লেখা কবিয়ালের ব্যক্তিগত পত্র।
দ্র. পুলক চন্দ। "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। কথাশিল্প, কলকাতা, ভারত। বৈশাখ ১৩৮৫। পৃ. ৭৮

৫ পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৮

৬ দ্র. পূর্ণেন্দু দস্তিদার। "কবিয়াল রমেশ শীল"। লালন পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ। আগষ্ট ১৯৬৩। পৃ. ৪

৭ মধ্যযুগের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চট্টগ্রামের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বার্মায় চাকুরী ও ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করত। এ বিষয়ে একটি লোকছড়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহুল প্রচলিত;

'ইক্কিনি বাছার গুণগুণি ঠেং
কে-নে বাছা রেঙ্গুন গেল···

[এতটুকুন ছেলে, ছোট ছোট পা,
কি করে ছেলে রেঙ্গুন গেল···]

৮ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা', "আমার বাংলা"। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভারত।

৯ "কবিয়াল রমেশ শীল"। পৃ. ৬

১০ অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তীকে লেখা কবিয়ালের ব্যক্তিগত পত্র।
দ্র. "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. ৮০

১১ দ্র. "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. পঁচিশ

১২ এ বিষয়ে তাঁর রচনায় পাওয়া যায়,

··· 'শুন আর এক বিবরণ,
জ্বলে মন উঠিলে মনেতে,
হাজী নস্থ মালুম ছিল মাদারবাড়ীতে

কি কব তার গুণের কথা
যথা তথা আছয়ে প্রকাশ, ···

দ্র. "কবিয়াল রমেশ শীল"। পৃ. ৬

১৩ মাইজভাণ্ডারে পীরের প্রতিষ্ঠা বঙ্গে লৌকিক পীরবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ভিন্ন পথগামী সুফী মতবাদ হতে এ সকল লৌকিক পীরবাদের সূচনা। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই মাইজভাণ্ডারের শিষ্য হতে পারে।

১৪ দ্র. রমেশ শীল। 'নিবেদন', "আশেকমালা"। পুলিনবিহারী শীল, গোমদণ্ডী, চট্টগ্রাম। ৪র্থ সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৭৯। পৃ. ক

১৫ কারও কারও মতে রমেশ শীলের মাইজভাণ্ডার ওরশে যাওয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিল ঔষধ বিক্রী। প্রসঙ্গতঃ রমেশ শীল নিজে কবিরাজী মতে রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁর প্রতিটি পুস্তকের তৃতীয় প্রচ্ছদে 'ফকিরি প্রদত্ত দুইটি রোগের ঔষধ' (বাতের ও যৌন রোগের)-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হত।

১৬ রমেশ শীলের একটি বক্তৃতার অংশ।
দ্র. "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. চব্বিশ

১৭ পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মতে হেদায়েত ইসলাম ও ফণি বড়ুয়া এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। [দ্র. "কবিয়াল রমেশ শীল"। পৃ. ২২] হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে 'রমেশ উদ্বোধন-কবি-সংঘ'-এর কমিটি ছিল নিম্নরূপ ;

সভাপতি : রমেশ শীল। সহ-সভাপতি : হেদায়েত ইসলাম খাঁ।
সম্পাদক : ধীরেন্দ্রলাল সেন। কোষাধ্যক্ষ : নগেন্দ্রচন্দ্র দে। সদস্য : ফণীন্দ্রলাল বড়ুয়া, রাইগোপাল দাস, মণীন্দ্র দাস, গোবিন্দচন্দ্র দে, বরদাচরণ দে, তারাচরণ দাস ও সারদাচরণ বড়ুয়া'।
[দ্র. "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. বত্রিশ]

১৮ IPTA (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ) গঠন এ সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ফল।

১৯ দ্র. "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"। পৃ. চুয়ান্ন

২০ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গোপাল হালদার প্রমুখ।

২১ দ্র. "People's War." Calcutta, India. April 1, 1945 Issue.
সেদিনের গানের বিষয় ছিল "কৃষক ও মজুতদার'।

২২ "কবিয়াল রমেশ শীল"। পৃ. ৪৪

২৩ সম্মেলনের অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে ছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যপাল অমৃতপদ ডাঙ্গের ভাষণ।

২৪ এই সময়ে রমেশ শীল শেখ গোমানির সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গান করেন। আবার পার্ক সার্কাস এলাকায় 'যুদ্ধ ও শান্তি' শীর্ষক কবিগানে অংশ নেন।

২৫ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, মুল্‌করাজ আনন্দ, কৃষণ চন্দর, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, তিমির বরণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মনোজ বসু, রমেশ চন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, নরেন

দেব, হীরেন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, পঙ্কজ মল্লিক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

২৬ জেলে তার সহবন্দীরা যে খাতা উপহার দেন তার মধ্যে মোস্তফা সারওয়ার, সত্যেন সেন, গাজীউল হক, সন্তোষ গুপ্ত ও চুনী চক্রবর্তীর কবিতা এবং আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুস সাত্তার, আমির-উল-ইসলাম প্রমুখের শ্রদ্ধাঞ্জলি রয়েছে।

২৭ দ্র. পত্র No. 1004-Edn. Dated Dacca, 5-2-1959. Memo No. 711/35 OM-1S-57 Education Department, Govenment of East Pakistan.

২৮ দ্র. পত্র No. 203-Edn. Dated Dacca, 20-4-1962. Memo No. 4311/45 OM-61S/57 Education Department, Government of East Pakistan.

২৯ চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও গোমদণ্ডীর পার্শ্ববর্তী কধুরখীল গ্রামে জসীম-উদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখের সঙ্গে রমেশ শীল রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেন।

৩০ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওস্তাদ আয়েত আলী খান।

৩১ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের হস্তলিখিত এই মানপত্রটি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

৩২ দ্র. বা/এং পত্র নং : ১৭৩/২। তারিখ ৬-১-১৯৬২

৩৩ রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাইফুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, ওহীদুল আলম, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মুহম্মদ ইউনুস, মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ প্রমুখ। সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল ফজল। অন্যান্যের মধ্যে এ সভায় কবি জসীমউদ্‌দীন ও মাহমুদ নুরুল হুদা আলোচনায় অংশ নেন।

৩৪ দ্র. "স্মারক"। রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। এপ্রিল ১৯৬৪। পৃ. ৯

৩৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ৯-১-৬৪ তারিখে এক পত্রে কবিয়াল এ সব কথা লিখেন।

৩৬ তাঁর এ বিষয়ক একটি পত্রের প্রতিলিপি বর্তমানে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর সাংবাদিক অরুণ দাশের নিকট সংরক্ষিত আছে।

৩৭ দ্র. নূরুল ইছলাম চৌধুরী। "অপরাজেয় লোক-কবি করিম বখ্‌শ"। বুক সেণ্টার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ১৯৬৫। পৃ. ১০

৩৮ দ্র. পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯

৩৯ পূর্ণেন্দু দস্তিদার (সম্পাদিত)। "লোকগীতি"। রমেশ শীল সম্বর্ধনা সংসদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। এপ্রিল ১৯৬৪।

৪০ পুলক চন্দ (ভূমিকা ও সংকলন)। "গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান"।

৪১ দ্র. পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০

৪২ দ্র. আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত)। "পাণ্ডুলিপি", নবম খণ্ড। বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ১৩৮৮।